KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 6/1 6/2 6/3 6/4. 6/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ আষাঢ় ১৩২৫ শ্রাবণ ১৩২৫. ভাদ্র ১৩২৫
	Condition : Brittle / Good ✓ (Brittle)
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

ওমর-খৈয়াম।*

ফার্সি আমরা জানি নে, কিন্তু ও-ভাষার বড় বড় কবিদের নাম আমাদের সকলেরই নিকট সুপরিচিত। হাফেজ ও সাদীর নাম ভদ্রসমাজে কে না জানে? ওমর-খৈয়ামের নাম কিন্তু দু'দিন আগে এদেশে কেউ শোনে নি, এমন কি ফার্সি-নবিশেরাও নয়। যদিচ এযুগের সমজদারদের মতে তিনিই হচ্ছেন ইরাণদেশের সব চাইতে বড় কবি।

আজকের দিনে ওমর যে আমাদের একজন অতিপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছেন, সে ইউরোপের প্রসাদে। ওমর প্রায় হাজার বছর আগে পারস্যদেশের নৈশাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তাঁর কবিত্বের খ্যাতি কালক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক্—সাহিত্যসমাজে তাঁর নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে এসেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ-কবি ওমরকে আবিষ্কার করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে' ইউরোপের চোখের সুমুখে ধরে দেন।

আকাশ-রাজ্যে একটি নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হলে বৈজ্ঞানিক-সমাজ যেমন চঞ্চল ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, মনোরাজ্যে এই নব-নক্ষত্রের আবিষ্কারে ইউরোপের কবি-সমাজ তেমনি চঞ্চল ও উৎফুল্ল

* শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ওমর-খৈয়ামের "রুবেইয়াৎ" নামক কবিতা-গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ লিখিত। সঃ সঃ

হয়ে উঠলেন। ফলে এযুগে ইউরোপের এমন নগর নেই যেখানে এই নব কাব্যরসের ঐকান্তিক চর্চ্চার জন্য একাধিক কাব্যগোষ্ঠী গঠিত হয় নি। এই নব নক্ষত্রের একটি নব উপাসক-সম্প্রদায়ও সে দেশে গড়ে উঠেছিল, শুনতে পাই গত যুদ্ধে সে সম্প্রদায় মারা গেছে। সে যাইহোক, সেকালের এসিয়ার কবিতা একালের ইউরোপের হাতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং আমরাও তার অপূর্ব্ব রূপ দেখে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

(২)

এ কবিতার জন্ম হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। ওমর-খৈয়াম ছিলেন একজন মহা পণ্ডিত। তিনি সারা জীবন চর্চ্চা করেছিলেন শুধু বিজ্ঞানের, কাব্যের নয়। অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে তিনি সেকালের সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই জ্ঞান-চর্চ্চার অবসরে গুটি-কয়েক চতুষ্পদী রচনা করেন, এবং সেই চতুষ্পদীক'টিই তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থ। এত কম লিখে এত বড় কবি সম্ভবত এক ভর্ত্তৃহরি ছাড়া আর কেউ কখন হন নি। ভর্ত্তৃহরির সঙ্গে ওমরের আরও এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে। উভয়েই জ্ঞানমার্গের কবি, ভক্তিমার্গের নন।

ওমরের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন—

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা, এই কথাটা জানতে চাই
* * * *
যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে?— * *

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর-খৈয়াম বলেন—

"সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্যমিথ্যা কিছুই নাই"।

ওমর যে সেকালের মুসলমান সমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, এবং একালের ইউরোপীয় সমাজে আদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। যাঁরা মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে এ মত শুধু অগ্রাহ্য নয়—একেবারে অসহ্য; কেননা এ কথা ধর্ম্মমাত্রেরই মূলে কুঠারাঘাত করে। অপরপক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জন্য এ যুগের ইউরোপের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কোনও নূতন বিশ্বাস খুঁজে পায় নি। সুতরাং ওমরের কবিতায় বর্ত্তমান ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুণ ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল।

(৩)

এস্থলে কেউ বলতে পারেন যে "Vanity of vanities—all is vanity" এসিয়ার এই প্রাচীন বাণী ত দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের কানে পৌঁচেছিল। বাইবেলের একটা পুরো অধ্যায়ে (Ecclesiastes) ত ঐ কথাটারই বিস্তার করা হয়েছে, প্রচার করা হয়েছে; অতএব ওমরের বাণীর ভিতর কি এমন নূতনত্ব আছে যাতে-করে সে বাণী ইউরোপের মনকে এতটা পেয়ে বসেছে?—

নূতনত্ব এই যে—ওমরের মতে, যে প্রশ্ন মানুষে চিরদিন করে' আসছে, বিশ্ব কোনদিনই তার উত্তর দেয় না, কেননা দিতে পারে না। তাঁর চোখে এই সত্য ধরা পড়েছিল যে, এ বিশ্বের অন্তরে হৃদয় নেই, মন নেই, এ জগৎ অন্ধ নিয়তির অধীন, সুতরাং তার ভিতর-বাহির দুই-ই সমান অর্থহীন, সমান মিছা। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে—

"ঊর্দ্ধে অধে, ভিতর বাহির, দেখ্‌ছ যা সব মিথ্যা ফাঁক,
ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী, পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক।"

* * * *

সদ্য ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রিদিন
মরণ-পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই।"

অপরপক্ষে আমাদের দেশের রাজকবি ভর্তৃহরির মত জেরুজিলামের রাজকবিরও মুখে, "Vanity of vanities—all is vanity" এ বাক্যের অর্থ "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য"। অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইহুদী কবি দুজনেই এই বিশ্বের অন্তরে "এমন একটি সার সত্য, এমন একটি নিত্য বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন, যেখানে মানুষের মন দাঁড়াবার স্থান পায়, এবং যার সাক্ষাৎকার লাভ করলে মানুষ চিরশান্তি, চির আনন্দ লাভ করে"। ওমার খৈয়ামের মতে, ও হচ্ছে শুধু মানুষের মন-ভোলানো কথা—আসল সত্য এই যে, জগৎও মিথ্যা ব্রহ্মও মিথ্যা। পূর্ব্বোক্ত রাজকবিরা মানুষের চোখের সুমুখে একটি অসীম আশার মূর্ত্তি খাড়া করেছিলেন, ওমর-খৈয়াম করেছেন অনন্ত

নৈরাশ্যের। ওমরের বাণী আমাদের মনকে জাগিয়ে তোলে, কেননা এ যুগে আমরা কেউ জোর করে বলতে পারি নে যে, আমরা সৃষ্টির গোড়ার কথা আর শেষ কথা জানিই জানি।

(৪)

এতক্ষণ ধরে ওমরের দর্শনের পরিচয় দিলুম এই কারণে যে, এই দর্শনের জমির উপরই তাঁর কবিতার ফুল ফুটে উঠেছে। যাঁদের মতে "জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য", তাঁরা আমাদের উপদেশ দেন—

"মায়াময়মিদং অখিলং হিত্বা
প্রবিশাশু ব্রহ্মপদং বিদিত্বা।"

ওমরের মতে কিন্তু "মায়াময়মিদং অখিলং" হচ্ছে একমাত্র সত্য—অবশ্য সার সত্য নয়, অসার সত্য। তিনি তাই উপদেশ দিয়েছেন—

"এক লহমা সময় আছে সর্ব্বনাশের মধ্যে তোর,
ভোগ-সাগরে ডুব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর।"

বলা বাহুল্য ওমরের মুখে এ কথা হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী। এ জীবনের যখন কোনও অর্থ নেই, তখন যা ইন্দ্রিয়গোচর আর যা অনিত্য তাকেই বুকে টেনে নিয়ে আসা যাক্, তাকেই উপভোগ করা যাক্। ওমরের পূর্ব্বেও অনেকে মানুষকে এই উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কথার সঙ্গে ওমরের কথার অনেকটা প্রভেদ আছে। যাঁরা বলতেন "eat, drink and be merry, for to-morrow we die," তাঁরা বিশ্ব-সমস্যার দিকে

একেবারেই পিঠ ফিরিয়েছিলেন। আর প্রাচীন গ্রীসের Epicurean-রা যা-কিছু ইন্দ্রিয়-গোচর তাকেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিয়ে ইন্দ্রিয়-সুখের চর্চ্চাটা একটি সুকুমার বিদ্যা করে' তুলেছিলেন; এস্থলে বলা আবশ্যক যে, তাঁরা ইন্দ্রিয় অর্থে বহিরিন্দ্রিয় ও মানসেন্দ্রিয় দুই-ই বুঝতেন।—তাঁরা ছিলেন শান্তিতে, কিন্তু ওমরের হৃদয়মন চির অশান্ত। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যে ব্যর্থ—এ সত্য ওমর সন্তুষ্টমনে মেনে নিতে পারেন নি, এর বিরুদ্ধে তাঁর সকল মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে বিশ্বের বিরুদ্ধে মানবাত্মার বিদ্রোহ, উপহাস ও বিদ্রূপের আকারে ফুটে বেরিয়েছে, কিন্তু তাঁর সকল হাসিঠাট্টার অন্তরে একটি প্রচ্ছন্ন কাতরতা আছে,—এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। ওমর-খৈয়ামের কবিতা যে আমাদের এতটা মুগ্ধ করে তার প্রধান কারণ, তিনি দার্শনিক হলেও কবি, এবং চমৎকার কবি। দর্শন তাঁর হাতে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করে নি, ফুলের মত ফুটে উঠেছে। এবং সে ফুল যেমন হাল্‌কা, যেমন ফুরফুরে, তেমনি সুন্দর, তেমনি রঙীণ। এর প্রতিটি হচ্ছে ইরাণদেশের গোলাপ,—এ গোলাপের রঙের সম্বন্ধে ওমর জিজ্ঞাসা করেছেন—

"কার্ দেওয়া সে লাল্‌চে আভা, হৃদয়-ছ্যাঁচা শোণিত-ছাপ"—

এর উত্তর অবশ্য—ওমর! তোমার। অথচ এই রক্তে-নাওয়া গোলাপগুলির মুখে একটি সহাস্য don't-care ভাব আছে। আর তাদের বুকে আছে একাধারে অমৃত ও হলাহলের মিশ্রগন্ধ—এক কথায় মদিরগন্ধ। ওমরের কবিতার রস ফুলের আসব, সে রস পান করলে মানুষের মনে গোলাপী নেশা ধরে এবং সে অবস্থায় আমাদের

মন থেকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের ভাবনাচিন্তা আপনা হতে ঝরে পড়ে।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ এই মন-মাতানো কাজ-ভোলানো কবিতা-গুলি বাঙলা করে' বাঙালী পাঠক-সমাজের হাতে ধরে দিচ্ছেন; আশা করি সেগুলো সকলের আদরের ও আনন্দের সামগ্রী হবে, কেননা এ অনুবাদের ভিতর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, নৈপুণ্য আছে, প্রাণ আছে। ওমর-খৈয়ামের এত স্বচ্ছন্দ ও স-লীল অনুবাদ আমি বাঙলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখি নি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

উপকথা।

—:*:—

(ফরাসী হইতে অনূদিত)

ট্রাম।

একজন মজুর ছিল, খাট্‌তে যার জুড়ি আর কেউ ছিল না। আর তার স্ত্রী ছিল যেমন ভাল, তার ছোট্ট মেয়েটি ছিল তেমনি সুশ্রী। তারা বাস করত একটা মস্ত সহরের একটুখানি জায়গায়।

একবার একটি পরবের দিনে, তারা একটি কবুতর কিনে নিয়ে এল, তার কাবাব করবার জন্যে—এবং সেই সঙ্গে অল্পস্বল্প ভাল ভাল শাক-সবজিও। সে রবিবারে তাদের ক'জনের আনন্দের আর সীমা ছিল না, এমন কি বাড়ীর বিড়ালটি পর্য্যন্ত আড়চোখে সেই কবুতরের দিকে চেয়ে মনে মনে হেসে বল্‌লে যে, "আজ এমন হাড় চুষতে পাব, যার ভিতর রস আছে"!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর বাপ বল্‌লে—

—"আজ যা'হোক কিছু পয়সা খরচ করে একটিবার আমরা ট্রামে চড়বই—এবং সহরের শেষ পর্য্যন্ত যাব।"

তারপর তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তারা চিরদিনই দেখে আসছে যে, ভাল ভাল পোষাক-পরা সাহেব মেমরা আঙুল তুলে ইসারা করবামাত্র কণ্ডাক্টর অমনি ঘোড়া রুখে ট্রাম থামায়—তাদের তুলে নেবার জন্য।

সেই বারোমাস খেটে-খাওয়া মজুরটি তার মেয়ের হাত ধরে আর তার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে, একটি বড় রাস্তার একধারে গিয়ে দাঁড়ালে।

একটু পরেই তারা দেখতে পেলে যে একটি বার্নিসকরা চক্‌চকে ট্রামগাড়ি তাদের দিকে আসছে, তার ভিতর লোক প্রায় ছিল না বল্‌লেই হয়। তাই দেখে তাদের মহা আহ্লাদ হল—এই ভেবে যে, প্রতিজনে চার চার পয়সা খরচ করে' তারা আজ ট্রামে চড়ে সহর ঘুরে আসবে। অমনি তারা আঙুল তুলে ইসারা করলে—ট্রাম থামাবার জন্যে। কণ্ডাক্টর কিন্তু তাদের কাপড় চোপড় দেখে বুঝতে পারল যে তারা নেহাৎ গরীব, তাই সে অবজ্ঞাভরে তাদের দিকে চেয়ে ট্রাম আর বাঁধ্‌লে না, সটান চলে গেল।

মনীষা।

মানুষের মনের ঐশ্বর্য্য যে সব বইয়ে সঞ্চিত ছিল, সে-সব বই একদিন এক যাদুমন্ত্রে পৃথিবী থেকে উড়ে গেল।

তখন বিদ্বজ্জনের এক মহা সম্মিলনী হল। যাঁরা গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি শাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁরা সকলে পরামর্শ করে একমত হয়ে বল্‌লেন—

মানব-প্রতিভার যা-কিছু শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি, সে-সকল আমাদের কাছে গচ্ছিত রয়েছে, আমরাই সে-সবের রক্ষক; অতএব আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সে-গুলো উদ্ধার করে, মার্বেল পাথরে খুদে রাখবো, যাতে করে সেগুলো আর লোপ না পায়:—অবশ্য মানব-প্রতিভার সেই সেই কীর্ত্তি, যার প্রতিটি হচ্ছে গগন-স্পর্শী। এ প্রস্তর-ফলকে জায়গা

হবে শুধু Pascal-এর একটি চিন্তার, Newton-এর একটি তারার, Darwin-এর একটি পতঙ্গের, Galileo-র একটি ধূলিকণার, Tolstoy-এর একটু করুণার, Henri Heine-র একটি শ্লোকের, Shakespeare-এর একটি মর্ম্মোচ্ছ্বাসের, Wagner-এর একটি সুরের।

অতঃপর তাঁরা যখন একাগ্রমনে তাঁদের স্মরণপথে আনবার চেষ্টা করলেন মানুষের মনের কেবল কোন্ কোন্ সৃষ্টি মানবজাতির মাহাত্ম্য-রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তখন তাঁরা সভয়ে আবিষ্কার করলেন যে, তাঁদের মাথার ভিতর কিছুই নেই,—সব খালি।

পশুর স্বর্গলোক।

একটা বদ্ধ-গাড়ীতে যোতা বুড়ো-হাবড়া ঘোড়া, রাতদুপুরে একটি আমোদের আড্ডার দরজার সামনে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছিল আর ঝিমচ্ছিল। ভিতরে মেয়েপুরুষের হাসিতামাসা চল্‌ছিল।

সেই মড়া-খেকো-হাড়-বের-করা কৃষ্ণের জীবটি, কতক্ষণে এদের আমোদ শেষ হবে, এবং সে আবার তার ভাঙাচোরা অতি নোংরা আস্তাবলে ঢুকতে পাবে, সেই অপেক্ষায় অতি ম্রিয়মান্ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল,—কেননা তার পা আর তার শরীরের ভার বইতে পারছিল না।

আজ তার মনে তার ছোটবেলার স্মৃতি সব অস্পষ্ট স্বপ্নের মত ভেসে বেড়াচ্ছিল। তার মনে পড়ে গেল যে এক সময় সে ছিল লাল রঙের একটি বাচ্ছা, আর তখন সে সবুজ মাঠের উপর ছুটোছুটি

লাফালাফি করে বেড়াত, আর তার মা তার গা খালি ময়লা করে দিত, নিজের গায়ের ঘেঁস দিয়ে।

হঠাৎ সে সেই কাদায়-প্যাচ্‌পেচে রাস্তার উপর সটান শুয়ে পড়ে মরে গেল।

তারপর সে স্বর্গের দুয়োরে গিয়ে হাজির হল। একজন মস্ত পণ্ডিত, কতক্ষণে Saint Peter তাঁর জন্য দুয়োর খুলে দেন, তারি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেই ঘোড়া বেচারাকে বললেন—

"তুই বেটা এখানে কি করতে এসেছিস?—স্বর্গে প্রবেশ করবার অধিকার তোর নেই—আছে আমার, কেননা আমি মানবীর গর্ভে জন্মেছি।

উত্তরে সেই হাড়-বের-করা ঘোড়া বেচারা বল্লে—

"আমার মা'র মন বড় নরম ছিল। সে পৃথিবীতে বুড়ী হয়ে যখন মারা গেল, তখন যত জোঁকে মিলে তার রক্ত শুষে খেলে। আমি ভগবানের কাছে শুধু জানতে এসেছি, সে এখানে আছে কি না"

তখন স্বর্গের দরজার দুই-পাল্লা একসঙ্গে খুলে গেল, এবং সুমুখে দেখা গেল রয়েছে পশুর স্বর্গলোক। ঘোড়াটি দেখলে যে তার মা সেখানে আছে। দেখবামাত্র তার মাও তাকে চিনতে পারলে, অমনি চিঁহি রবে দু'জনে দু'জনকে সাদর সম্ভাষণ করলে। তারপর তারা স্বর্গের প্রকাণ্ড ময়দানে বেড়াতে গেল। সেখানে গিয়ে এই দেখে তার মহা আহ্লাদ হ'ল যে, তার মর্ত্যের কষ্ট-জীবনের পুরোনো সঙ্গীরা সবাই সেখানে মহাসুখে বাস করছে। পৃথিবীতে যারা সহরের সান-বাঁধানো রাস্তায় পাথর-বোঝাই গাড়ী টেনে বেড়াত, আর পা পিছ্‌লে ক্রমান্বয় হাঁটুর উপর বসে পড়ত, তারপর মারের চোটে আধমরা হয়ে গাড়ী ঘাড়ে

করে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ত ; আর যারা চোখে ঠুলি পরে' দিন দশঘণ্টা করে ঘানি ঘোরাত ; আর যে ঘোড়িগুলোর পিঠে চড়ে মানুষে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে যেত, আর ষাঁড়ের শিংয়ের ঘায়ে যাদের চেরাপেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আখ্‌ড়ার তপ্তবালি ঝেঁটিয়ে যেত, আর তাই দেখে ভদ্র-মহিলাদের মুখ আনন্দে রাঙা হয়ে উঠত,—সেই সব ঘোড়া সেখানে ছিল। স্বর্গের সেই প্রকাণ্ড ময়দানে তারা চির শান্তির মধ্যে মনের সুখে চরে' বেড়াচ্ছিল।

তা ছাড়া সেখানে অপর সকল জন্তুরাও মহা স্ফূর্ত্তিতে ছিল। দিব্যি চিকন বেড়ালগুলো আপনভাবে বিভোর হয়ে খোসমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা ভগবানের কথাও মানছিল না, আর তিনি তাদের এই অবাধ্যতা দেখে শুধু হাসছিলেন। তারা কটায় মিলে এক টুক্‌রো দড়ি নিয়ে এমন ধীরভাবে লঘু পদাঘাতে সেটিকে ঠেলছিল, যেন সে কাজের ভিতর এমন একটা মহা অর্থ আছে, যা তারা খুলে বলতে চায় না।

আর কুকুরগুলো সব বড় ভাল মা। তাদের সময় ত বাচ্ছা-গুলোকে দুধ দিতে দিতেই কেটে যাচ্ছিল। মাছগুলো সব সাঁতরে বেড়াচ্ছিল—ছিপের ভয় ত আর তাদের নেই। পাখীরা যার যেদিকে মন চায় সে সেদিকে উড়ে যাচ্ছিল,—ব্যাধের ভাবনা ত আর তাদের ভাবতে হয় না।

এই স্বর্গলোকে কোন মানুষ ছিল না।

জীবনের পথ।

একজন কবি একদিন কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন একটি গল্প লেখবার জন্য। তাঁর মাথায় সেদিন কোন আইডিয়াই এল না।

সেদিন কিন্তু তাঁর মন খুব প্রফুল্ল ছিল, কেননা জানলার ধারে একরাশ লাল ফুলের উপর সূর্য্যের আলো পড়েছিল, আর সেই খোলা জানলার নীল ফাঁকের ভিতর একটি সোনালি মাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ তাঁর সমগ্র জীবনের ছবিটে তাঁর চোখের সুমুখে এসে দাঁড়াল। তিনি দেখলেন যে, সে একটি লম্বা সাদা পথ। সে পথ সুরু হয়েছে একটি অন্ধকার বনের গা থেকে, যার পায়ের কাছে জল খল্‌খল্ করে হাসছে ; আর শেষ হয়েছে, শান্তিতে ঘেরা একটি ছোট্ট কবরে, যে কবরকে কাঁটাগাছ আর গাছের শিকড়ে চারধার থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে, জড়িয়ে ধরেছে।—

এইখানে তিনি সেই দেবতার সাক্ষাৎ পেলেন, জন্ম থেকে তাঁর জীবনের ভার যে দেবতার হাতে ছিল। সে দেবতার কাঁধে বোল্‌তার পাখার মত সোণালি রঙের একজোড়া পাখা ছিল। তাঁর মাথার চুল একেবারে সাদা, আর তাঁর মুখটি গ্রীষ্মকালের চৌবাচ্চার জলের মত স্বচ্ছ ও প্রশান্ত।

দেবতা কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"তুমি যখন ছোট ছিলে, তখনকার কথা কি তোমার মনে পড়ে ?—তোমার বাবা নদীতে ছিপে মাছ ধরতে যেতেন, আর তোমার মা ও তুমি তাঁর সঙ্গে যেতে। আর এই জলের ধারে মাঠের উপর কত চমৎকার ফুল ফুটে থাকত, আর ফড়িঙরা সব লাফিয়ে বেড়াত, দেখে মনে হত যেন এখানে ওখানে ঘাসের ছেঁড়া পাতা সব চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।"

কবি উত্তর করলেন—"হাঁ, পড়ে"।

তারপর দুজনে একসঙ্গে গিয়ে সেই নীল নদীর ধারে দাঁড়ালেন। তার উপরে ছিল নীল আকাশ আর পাড়ে ঘোরনীল বাদামের গাছ।

—"তাকিয়ে দেখো, এই হচ্ছে তোমার শৈশব"।

কবি জলের দিকে চাইলেন আর অমনি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—"কৈ, আমি ত এ জলের ভিতর আমার বাপ-মার সস্নেহ মুখচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি নে? তাঁরা দুজনে এইখানে বসে থাকতেন। তাঁদের মনে কোনও পাপ ছিল না, ছিল শুধু শান্তি আর সুখ। আমার পরনের ধোপ কাপড় আমি কেবলি ময়লা করতুম, আর আমার মা বারবার তাঁর রুমাল দিয়ে তা' পরিষ্কার করে দিতেন।

"হে দেব আমাকে বলো, এই জলের উপর আমার বাপ-মার মুখের যে সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়ত, সে প্রতিবিম্ব কোথায় গেল? আমি তা দেখতে পাচ্ছি নে, মোটেই দেখতে পাচ্ছি নে।"

এই সময় খাসা এক থোকা বাদাম পাড়ের একটা গাছ থেকে খসে' জলের উপরে পড়ে' স্রোতের মুখে ভেসে যেতে লাগল।

দেবতা তখন বললেন—

—"এই জলের উপরে-পড়া তোমার বাপ-মার মুখের ছবি, ঐ সুন্দর ফলগুলোর মতই স্রোতের মুখে ভেসে চলে গিয়েছে। কেননা সবই স্রোতে ভেসে চলে যায়, যার কায়া আছে তাও, আর যা ছায়ামাত্র তাও। তোমার বাপ-মার ছবি জলে মিশেছে, যা অবশিষ্ট আছে তার নাম স্মৃতি। তুমি ততটা অধীর হয়ো না, যাদের তুমি এত ভালবাসতে তাদের স্মরণ-চিহ্ন সব আবার দেখতে পাবে।"

একটা নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এসে শরবনের উপর বসল। অমনি কবি বলে উঠলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি এই পাখা দুটির উপরে আমার মায়ের চোখের রঙ চারিয়ে গিয়েছে"।

দেবতা বললেন—"ঠিক কথা, আর একটু ভাল করে চেয়ে দেখো।"

একটি গাছের আগ্‌ডালে একটি সাদা ঘুঘু তার বাসা বেঁধেছিল, সেখান থেকে সাদা রঙের একটি হালকা পালক উড়ে এসে জলের উপর পড়ে' পাক খেতে লাগল।

কবি অমনি বলে উঠলেন—

—"এই পালকটির গায়ের এই শুভ্রতা, একি আমার মা'র অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা নয়?"

দেবতা বললেন—"ঠিক বলেছ।"

তারপর একটু হাওয়া উঠল, তার স্পর্শে জলের গায়ে কাঁটা দিলে, পাতার মুখে মর্ম্মর-ধ্বনি ফুটল।

কবি অমনি জিজ্ঞাসা করলেন—

—"এই যে মধুর ও গম্ভীর শব্দ আমার কানে আসছে, এ কি আমার বাবার কণ্ঠস্বর নয়?"

দেবতা উত্তর করলেন—"ঠিক বলেছ"।

* * * *

বেলা দুপুর হলো। নদীর একধারে কতকগুলো সরল গাছ ধীরে ধীরে হেলছিল আর দুলছিল। তাদের মধ্যে যেটি মাঠের একটেরে একা দাঁড়িয়েছিল, সেটিকে দূর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে যুবতীর মত দেখাচ্ছিল। তখন আকাশের আলো এমন সুন্দর হয়ে উঠেছিল

যে, মনে হচ্ছিল সে আকাশ যেন যুবতীর গণ্ডস্থলের রঙে রাঙানো হয়েছে।

তখন জীবনে সবপ্রথম যে তরুণীকে তিনি ভালবাসেন তার কথা কবির মনে পড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁর বুকটি ব্যথায় ভরে' উঠ্‌ল।

দেবতা বল্‌লেন—

—"তোমার ঐ ভালবাসা ছিল এত নিরাবিল এবং এতে তুমি এত দুঃখ পেয়েছ যে, এর জন্য আমি তোমার উপর রাগ করি নি।"—

তাঁরা দু'জনে ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হতে লাগলেন, ক্রমে বেলা পড়ে এল; আকাশের আলো এত নরম, এত কোমল হয়ে এল যে, মনে হল সে আলো যেন ছায়া হয়ে উঠেছে। কবির কাতরতা দেখে দেবতা ঈষৎ হাস্য করলেন, রুগ্ন মাতার মুখের হাসির মতই তা সকাতর ও করুণ।

একটু পরে চারিদিকের নিস্তব্ধতার ভিতর তারাগুলো সব ফুটে উঠ্‌ল। আকাশ তখন সেই মৃত্যুশয্যার মত দেখাতে লাগল, যার চারদিকে বড় বড় মোমবাতি জ্বলেছে, আর যাকে ঘিরে রয়েছে শুধু শব্দহীন বুক-ভাঙা শোক। আর রাত্রি যেন শোকাভিভূতা বিধবার মত মাটিতে হাঁটুপেতে নতমুখে অবস্থিতি করছে।

দেবতা জিজ্ঞাসা করলেন—

—"এ দৃশ্য চিনতে পারছ?"

কবি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মাটিতে হাঁটুপেতে নতমুখ হয়ে রইলেন।

অবশেষে তাঁরা যেখানে রাস্তার শেষ, সেই কবরটির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, যে কবরটিকে কাঁটা গাছ চারধার থেকে ঘিরে ফেলেছে আর গাছের শিকড় চারধার থেকে জড়িয়ে ধরেছে।

দেবতা তখন বললেন—

"আমি এসেছিলুম তোমাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দিতে। এই খানে এই জলের ধারে তুমি চিরদিন ঘুমবে। আর এই জল প্রতিদিন তোমার কাছে বয়ে নিয়ে আসবে তোমার সব স্মৃতির ছবি—নীলকণ্ঠ-পাখীর সেই পাখা, যার রঙ তোমার মা'র চোখের মত; ঘুঘুর সেই সাদা পালক, যা তোমার মা'র অন্তঃকরণের মত নির্ম্মল; পাতার সেই মর্ম্মরধ্বনি, যা তোমার বাবার কণ্ঠস্বরের মত মধুর ও গম্ভীর; আর সেই সরল গাছ, যা তোমার প্রিয়ার মত লম্বা ও ছিপ্‌ছিপে।"

সর্ব্বশেষে আস্‌বে তারায় আলো-করা চিররাত্রি।

* * * *

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অতীতের বোঝা।

—:০:—

পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। ইংরাজদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন নানা রকম রং মেখে সং সেজে উলঙ্গ শরীরে বন্য পশুর ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তখন নাকি এদেশে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের আলোচনা হত। এই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব নিয়ে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াই। কেউ কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পাড়্‌লে তখনই কোন না কোন বিদ্যা-দিগ্‌গজ চোখ রাঙিয়ে উত্তর দেন, "ও-সব আর বিলেত থেকে আমদানী কর্‌তে হবে না। ও-সব এবং আরও অনেক রকম জিনিস এ দেশে ছিল। পরের কাছে শোন্‌বার আর আমাদের কিছুই নেই। যা-কিছু থাকা উচিত বৈদিক-যুগে সবই ছিল। গোলযোগ ঘটেচে কেবল পৌরাণিক যুগে আর মুসলমান যুগে। তাই বলি আমাদের নূতন কিছু কর্‌তে হবে না, পুরোণো জিনিসগুলোর পুনরুদ্ধার কর্‌লেই সব চুকে যাবে।" বক্তৃতার সাথে কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোকের বাদাম-কিস্‌মিস্ মিশিয়ে পণ্ডিত ম'শায় নিরীহ শ্রোতার মানসিক ভোজনের মুখরোচক ব্যবস্থা করেন। শ্রোতা সাদা-সিধা লোক, এত বক্তৃতা, এত শ্লোক আওড়ান, হাত পা নাড়া এবং মুখ ভেঙ্‌চানো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে এর ভিতর কিছু সার না থাক্‌লে পণ্ডিতপ্রবর এতটা বাচালতা আর এতটা আত্ম-তুষ্টি

কখনই দেখাতে পার্‌তেন না। শ্রোতার অত-শত ভাব্‌বার সময় নেই, পড়্‌বারও সময় নেই, আর আলোচনা কর্‌বার সময় তো নেই-ই। তা ছাড়া বেচারা সংসারি লোক, রুটিনের বাইরে যাবার ইচ্ছাও কম, আর সাহসও অল্প। পণ্ডিতের কথা তার মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অলসতার অনুকূল হওয়ায় সে মাছের টোপ গেলার মত টপ করে সেটাকে গিলে ফেল্‌লে। ফলে পণ্ডিতের মর্য্যাদা বাড়্‌ল, নব্য-তান্ত্রিকদের যথেষ্ট নির্য্যাতন হল, এবং জন-সাধারণের পক্ষে নিরুদ্বেগে নিদ্রা দেবীর সুযোগ ঘটল।

(২)

ক্ষতি হল কিন্তু দেশের। প্রকৃতির একটা এই মহা দোষ যে, সে বক্তৃতা শোনে না। প্রকৃতি কোন দয়াময় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হয়েচে কি অণু-পরমাণুগুলোর উদ্দেশ্য বিহীন আকস্মিক সংযোগে ঘটেচে, সে বিষয় দার্শনিকদের মধ্যে মস্ত মতভেদ আছে। আমার কিন্তু ধারণা যে বঙ্গদেশীয়দের মতে প্রকৃতির এই বক্তৃতার প্রতি বিরাগই তার অনৈশ্বরিক উদ্দেশ্যহীনতার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতির যদি মাথামুণ্ডু থাক্‌ত তাহলে আমাদের এত বড় বড় বক্তৃতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের এত দুরবস্থা হবে কেন?

সত্য কথা এই যে, আমাদের এত জ্ঞান গরিমা সত্ত্বেও, সত্যের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প। এই সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা বক্তৃতা কর্‌তে শিখেচি, বিকট মুখভঙ্গি করে' ইংরাজি শব্দরাজির অপূর্ব্ব সমাবেশ

কর্‌তে শিখেচি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান কর্‌তে, তাকে নতশিরে মেনে নিতে এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে শিখি নি। সে শিক্ষা যদি আমাদের থাক্‌ত তাহলে ঐতিহাসিক কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রাচীন-কাল হতে আমরা খুঁজে খুঁজে কতকগুলো অসম্ভব তথ্য আমাদের আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ কর্‌বার জন্যে বার কর্‌বার ভাণ কর্‌তাম না এবং সেই-গুলো নিয়েই অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে আধুনিক সমস্যা সকলকে উপেক্ষা করে "তাইরে-নারে-না" গেয়ে ঘুরে বেড়াতুম না। এরূপ ব্যবহার ব্যক্তি-গত কিম্বা জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। যদি কিছুর পরিচায়ক হয় ত' সে জাতীয় দুর্ব্বলতার ও নিস্তেজতার।

(৩)

শুন্‌তে পাই, উঠ পাখি বিপদ দেখ্‌লে বালিতে মুখ লুকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনে করে চোখে দেখ্‌তে না পেলেই, আপদ দূর হল। আমরাও মনে করি চোখ বুজে থাক্‌লেই আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে বেঁচে যাব। প্রকৃতিকে কিন্তু অত সহজে বোকা বানান যায় না। ভগবানের যাঁতা আস্তে আস্তে ঘোরে বটে কিন্তু শেষে গুঁড়ো করেই ছাড়ে।

পাঠক জিজ্ঞাসা কর্‌বেন যে, প্রাচীনদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ কর্‌লেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙ্গা হল? আমার উত্তর এই যে, প্রাচীন কালের নজীরকে উপরোক্ত রূপ ভয় ভক্তি বিহ্বলনেত্রে দেখা এবং তার বিধানের পায়ে সসম্ভ্রমে আত্ম-সমর্পণ করা উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মের লঙ্ঘন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল, দুই মুহূর্ত্তের

অবস্থা কখনো এক হয় না। আজিকার দিন কালিকার দিনের অবিকল নকল হতে পারে না, কারণ, আজ এবং কালের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘট্‌চে তার সমষ্টি আজকে কাল হতে বিচ্ছিন্ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন করে' ফেলেচে; তার দরুণই আজ হচ্চে আজ, আর কাল হচ্চে কাল। কোন পার্থক্য না থাক্‌লে আমরা আজ আর কালের মধ্যে কোন মতেই প্রভেদ করতে পার্‌তাম না। বৈজ্ঞানিকের নজরে পৃথিবীর এক পলের অবস্থা আর এক পলের অবস্থা হতে বিভিন্ন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে মহাভারতের কিম্বা বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাতে তো কোন সন্দেহই হতে পারে না। এ সব সূক্ষ্ম তর্ক ছেড়ে যদি ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করে' বিচার করা যায়, তাহলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, ভারতের দুই যুগের অবস্থাতে প্রভেদ বিস্তর ও বিরাট। প্রাচীন কালে (যথা—মনুর যুগে) ভারতে এক হিন্দুজাতিরই বাস ছিল। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে ছিল না। তখনকার নীতি-প্রবর্ত্তকদের কেবল এক হিন্দু-সমাজের কথা ভাব্‌তে হয়েচে। এখন কিন্তু দেশের অবস্থা একেবারে বদ্‌লে গেচে। এখন এদেশে হিন্দু ছাড়া মুসলমান পার্শী প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা বাস কর্‌চে। বিদেশীরা এখন এদেশের রাজা হয়েচেন। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এখন এদেশের লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেচে। এই সব নূতন ঘটনা ঘটাতে দেশে নূতন নূতন জীবন সমস্যা এসে জুটেচে। এ সব সমস্যার কিরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু এবং তাঁহার সমসাময়িক লোকদের ভাব্‌বার সুযোগ হয় নি; সুতরাং এ সব বিষয় তাঁরা কিছুই লিখে যান নি। এখন হিন্দুদের নিজের বুদ্ধির

সাহায্যেই এ সব সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। মনু যখন হিন্দুর সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের প্রবর্ত্তন করেন, তখন ইয়োরোপের democratic হাওয়া এদেশেও আসে নি, এখন কিন্তু এসেচে এবং তেড়েই এসেচে। এখন হিন্দু যদি জাতিভেদের বাসি মড়া নিয়ে বসে থাকে তাহলে তার ভারতবর্ষ থেকে লোপ পাবারই সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ সকল সত্য হতে কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং সেটা এই যে, নূতন যুগের নূতন সমস্যার নূতন মীমাংসার দরকার।

(৩)

Experience একটি অমূল্য জিনিস। আমরা শিশু হতে বালককে, বালক হতে যুবককে এবং যুবক হতে বৃদ্ধকে অধিক জ্ঞানী এবং অধিক বিজ্ঞ বলে' মনে করি। এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে, বালক অনেক জিনিস দেখেচে যা শিশু দেখে নি, যুবক অনেক জিনিস দেখেচে যা বালক দেখে নি এবং বৃদ্ধ অনেক জিনিস দেখেচে যা যুবক দেখে নি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বেড়ে যায়। এ হিসাবে প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান বেশি, অন্তত হওয়া উচিত। বেকন বলেচেন যাদের আমরা প্রাচীন বলি তাঁরা প্রকৃত পক্ষে শিশু ছিলেন। যেটাকে আমরা প্রাচীনকাল বলি সেটাকে পৃথিবীর বাল্যকাল বলা উচিত এবং সেই হিসাবে যাদের আমরা নবীন বলি তাদের প্রবীন বলা উচিত এবং যে যুগকে আমরা নব্য-যুগ বলি সেটাকে প্রাচীন যুগ বলা উচিত। প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের

অন্যূন তিন হাজার বৎসরের বেশি অভিজ্ঞতা আছে; সুতরাং আমাদের জ্ঞানও তাঁদের অপেক্ষা সেই হিসাবে বেশি হওয়া উচিত। অতীত হচ্চে মানব সভ্যতার শৈশব। শিশু স্নেহের পাত্র, ভক্তির পাত্র নয়। অতীতকে অবশ্য ভালবাসা উচিত, কিন্তু তাই বলে তার কাছে পদানত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(৪)

শক্তির চর্চ্চার ফলেই শক্তি বাড়ে। প্রাণী-জগতে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রাণী যখন কোন বিশেষ শক্তি বাড়াবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকে, তখন সেই শক্তিও তার আশ্চর্য্য রকমেই বেড়ে যায়। এই স্বাভাবিক নিয়মের বলেই হরিণ দৌড়তে শিখেছে, পাখী উড়তে শিখেচে, আর মানুষ কথা কইতে শিখেচে। পক্ষান্তরে চর্চ্চা চলে' গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত শক্তিও ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে যায়, এমন কি শেষে সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েও যায়। এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাণী-জগতে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রে অনেক প্রকার জন্তু বাস করে, যাদের চোখ আছে অথচ তারা দেখতে পায় না। এক সময় তারা স্থলচর জন্তু ছিল এবং স্থলচরের জীবনোপযোগী ইন্দ্রিয় সকল তাদের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। তাদের বর্ত্তমান environment-য়ে ঐ সব পূর্ব্বার্জ্জিত শক্তি সমূহের ব্যবহার তাদের জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক হয় না, এর ফল এই হয়েচে যে, তাদের ঐ সকল অনাবশ্যকীয় ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হয়ে হয়ে শেষে একেবারে বিকল হয়ে গেচে। এখন এ সবের দ্বারা কোন কাজ হয়

না, ও-গুলো যেন প্রাণীর পূর্ব্ব-জীবনের ইতিহাস, আমাদের জানাবার জন্য এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যা বলা গেল তা মানসিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও সমান খাটে। মানুষের এই আত্ম-শক্তির চর্চ্চার পক্ষে তার অতীত হচ্চে একটা মস্ত বাধা। অতীতের প্রতি অতিভক্তি আর বর্ত্তমানের প্রতি অতি অভক্তি এদুই-ই হচ্চে একই মনোভাবের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। যে-জাতির বর্ত্তমানের উপর কোন বিশ্বাস নেই তার ভবিষ্যতেরও কোনো আশা নেই। আর বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানের উপর বিশ্বাস আর নিজের উপর বিশ্বাস একই বস্তু। আমরাই ত বর্ত্তমান। যে জাতি আমাদের মত অতীতকে আঁকড়ে ধরে' পড়ে' থাকে এবং পৈতৃক প্রথা নামক ঠাকুরের মন্দিরে সকাল সন্ধ্যে পূজো দেয়, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব সম্যক চর্চ্চার অভাবে নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তারা অবনতির নিম্ন হতে নিম্নতর স্তরে স্বাভাবিক নিয়মে নামতে থাকে। এই জন্য দেখা যায় উন্নতিশীল জাতিরা প্রাচীন প্রথার কিম্বা প্রাচীন authority-র বিশেষ সম্মান করে না, করলে তাদের উন্নতিশীলতাই চলে যেত। তারা নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করে', নিত্য নতুন নীতির প্রবর্ত্তন করে', নিত্য নতুন তথ্য সংগ্রহ করে', আর নিত্য নতুন experiment নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে দিন তারা এ সব ছেড়ে পুরাণ প্রথার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হয় সেই সেই দিন থেকেই তাদের উন্নতিশীল জীবনের সমাপ্তি হয়।

(৫)

প্রাচীন গ্রীসের কথা একবার মনে করুন। প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিত সোলোণকে (Solon) বলেন "তোমাদের গ্রীকদের চরিত্র

বালকের মত। তোমাদের মধ্যে না-প্রাচীনকাল-বিষয়ক জ্ঞান আছে, না-জ্ঞানের প্রাচীনতা আছে।" মিশরী যাকে নিন্দনীয় বলে' নির্দ্দেশ করেন সেই গুণেরই বলে গ্রীস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। তাদের বাল-সুলভ চঞ্চলতা ও অসন্তোষই তাদের সভ্যতাকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে তুলেছিল। যেদিন তাদের এই বালস্বভাব তাদের পরিত্যাগ করলে, যে দিন তারা জাতীয় কৃতকার্য্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে পূর্ব্ব-কীর্ত্তির চর্ব্বিত চর্ব্বনে প্রবৃত্ত হল সেই দিন থেকেই গ্রীসের অধঃপাতের সুরু হল।

যা গ্রীসে ঘটেছিল আরবেও তাই ঘটেছে। একটি মেষ-পালক বর্ব্বর জাতি এক মহাপুরুষের অপূর্ব্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে "আল্লাহো আকবর" রবে সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলে। মহাপুরুষের দত্ত মন্ত্রের ভীমনাদে সেকালের রাজ্য সাম্রাজ্যগুলো বাষ্প-নির্ম্মিত সৌধসম আকাশে বিলীন হয়ে গেল। আরব সভ্য-জগতে প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হয়ে মৃতপ্রায় সভ্যতাকে নব-জীবন দান করলে। দেশ বিদেশ দমন করে', পাহাড় পর্ব্বত লঙ্ঘন করে', সমুদ্র মহাসমুদ্র মন্থন করে', আরব যে সভ্যতা গড়েছিল, তা অপূর্ব্ব। আরবের এই উন্নতি পৈত্রিক প্রথার অনুসরণে হয় নি। হজরৎ মোহম্মদের পূর্ব্বকালিন অবস্থাকে তারা "আইয়ামে জাহেলিয়াৎ" (অন্ধকার যুগ) বলত। হজরতের সময় থেকে আরম্ভ করে প্রায় চারশত বৎসর পর্য্যন্ত আরবেরা ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই উন্নতির যুগে তারা নিত্য-নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিল এবং নানা দিকে নূতন নূতন Experiment করেছিল। তারপর প্রাচীনতার বাঁধ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ব্যবহার

জীবী (ফকিহ) এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের (মোহাদ্দেস প্রভৃতি) ইজ্জত বেশি হল। এই খানথেকেই আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

(৬)

সভ্যতা দেখ্‌তে পাই কালক্রমে এক জাতির হাত থেকে আর এক জাতির হাতে যায়, এবং তা হয়, যার হাতে যায় তার গুণে, আর যার হাত থেকে যায় তার দোষে। আরবের জরা-শিথিল হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা কেড়ে নিয়ে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হল। ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল। শ্রাবণের ধারায় স্ফীত স্রোতস্বতীর ন্যায় তাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল। সে স্রোত এখনো থামে নি। তামসিক যুগে ইউরোপও আমাদের মত authority-র উপাসক ছিল। প্রাচীনকালের উপর সেখানেও তাদের আমাদেরই মত অটল ভক্তি ছিল। Aristotle-এর উপর কথা বলবার ক্ষমতা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই ছিল না। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেচে। এখন জীবনের সঙ্গে অতীতের কোনও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ইউরোপীয়রা স্বীকার করেন না; তাঁরা এখন নিত্য নতুন সত্য আবিষ্কার কর্‌চেন, নিত্য নতুন জিনিসের নিত্য নতুন জিনিস নিয়ে experiment কর্‌চেন, এক নীতি ছেড়ে অন্য নীতি ধরচেন, এইরূপে তাদের আশা ও উদ্যমপূর্ণ জীবন কেটে যাচ্চে। রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়চে বই কমচে না।

(৭)

ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়। ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যেও একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তখনও তাদের মধ্যে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা আসে নি। যৌবন-সুলভ চঞ্চলতার প্রসাদে তারা নানা নীতির অনুসরণ করেছিল, নানা মতের প্রবর্ত্তন করেছিল, নানাবিধ সামাজিক বিধানের সৃষ্টি করেছিল এবং নৈতিক বৈজ্ঞানিক, কাব্য ও কলাবিষয়ক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় experiment করেছিল। ক্রমে তাদেরও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হল। জীবনে জড়তা এসে পড়্‌ল। যোড়শোপচারে প্রাচীনতার পুজো আরম্ভ হল। ফলে এই হল যে, হিন্দুজাতি নির্জ্জীবতার একটা মস্ত উদাহরণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের Nation—হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুয়ে মিলে গঠিত। এই দুই সমাজই নিজেদের জীবনের মূল্য ভুলে গিয়ে প্রাচীন প্রথার অনুকরণের বৃথা চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত কর্‌চে। এর ফল যে বিষময় হচ্চে, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার কোনো কারণ নেই। চোখ খুলে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন যে, এ পৃথিবী এক অনন্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র। এখানে মানুষে মানুষে, মানুষে পশুতে এবং পশুতে পশুতে জীবন-সংগ্রাম চলেচে। এই জীবন-সংগ্রামে যে জাতি নিত্য কালোপযোগী প্রথার উদ্ভাবন করতে পারে সে জাতিই টিকে যায়, অন্যেরা লোপ পেয়ে যায়। অতীতের গুরুভার ঘাড়ে করে যার পক্ষে চলাই কঠিন, তার পক্ষে এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার আশা কোথায়? আমারা যে ভাবে চল্‌চি সে ভাবে আর ক'

দিন চল্‌বে ? অতীতের বোঝা, মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের শরীরে কখনই জন্মাবে না ? কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি বিশেষ করে' হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ করছি। এদেশে হিন্দু মুসলমান দুজনেই নিজ নিজ অতীতের চাপে বসে পড়েচে, দুজনের দশাই সমান, এবং সে দশার নাম হচ্ছে দুর্দ্দশা।

ওয়াজেদ আলি।

নেশার জের।

——:*:——

তার নাম ছিল মিনা।

সে ছিল বিধবা ; সে ছিল যুবতী ; এবং সে ছিল সুন্দরী। তার গায়ে থাকত লেস বিরহিত সাদা ব্লাউজ ও পরণে থাকত পাড়-বিহীন সাদা রেশমের শাড়ী। বাহ্যিক আচার ব্যবহারে তার ব্রহ্মচর্য্যের লেশমাত্র ছিল না—অর্থাৎ সে সাবান মাখত, পান খেত এবং বেশ প্রসন্ন মনেই বিকালে ছাদে বেড়াত।

তার উপর সে ছিল বড়লোকের মেয়ে।

অতএব পাশের বাড়ীর মেসের ছেলেরা যে তার বিষয়ে পাঁচরকম ভাবত, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু তাদের, অন্তত তাদের মধ্যে একজনের ভাবনাটা যদি ভাবনাতেই থেকে যেত এবং লোভটা যদি ছাদের উপরে মিনাকে দেখেই চরিতার্থ হত, তা'হলে আর কিছু হোক আর না হোক, আমার এ গল্পটার সৃষ্টি হত না।

চিন্তা এবং কাজ, এ দুটোর মধ্যে যে বেড়াটা আছে, সেটা মেসের এক যুবক হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে দিলে এবং তার ফলে মিনার হাতে একখানা চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠিটা পড়ে তার মুখে যে একটা লালিমার আভা দেখা গিছ্‌ল, সেটা রাগে কি অনুরাগে—তা' বলা

বড় কঠিন; কেননা নারীর মনের খবর তাঁরা নিজেরা না দিলে স্বর্গের রিপোর্টারদেরও তা জানবার সম্ভাবনা নেই। এটা শাস্ত্রের বচন, অতএব সত্য।

কিন্তু যখন রোজ একখানা করে চিঠি আসতে লাগল তখন মিনার গণ্ডে লালিমার সঙ্গে ভ্রূযুগলেও কুঞ্চিত-রেখা ফুটে উঠতে লাগল। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তার মনে বিরক্তির ভাবটা ঘনীভূত হয়ে আসছিল, কেননা ভ্রূকুটি বিরক্তির লক্ষণ। এটাও অলঙ্কার শাস্ত্রের ন অতএব গ্রাহ্য।

স্ত্রীলোকের সংসার-জ্ঞান, বয়সের অনুপাতে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তার উপর মিনা আজন্ম কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজেই বর্দ্ধিত। অতএব তার বাইশ বছরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যে মেসে-পালিত পঁচিশ বছরের পাড়াগেঁয়ে যুবকের চেয়ে বেশি হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি। কল্পনা দেবীর অনুগ্রহটাও ও-পক্ষের চেয়ে এ-পক্ষে একটু বেশি পরিমাণে পড়েছিল। সেইজন্যই মিনার মনে বিরক্তির সঙ্গে ভয়ের মিশ্রন একটুও ছিল না এবং ঠিক সেই কারণেই মেসের যুবকটির অন্তরে ভয়ের ভাব যথেষ্ট থাকলেও মিনার নীরব প্রত্যাখ্যানে বিরক্তির কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি।

এমন সময়ে এলাহাবাদ থেকে বৌদিদি চিঠি লিখলেন, "ঠাকুরঝি, তুমি যে ছোকরাটার কথা লিখেছ, তাকে আর প্রশ্রয় দিওনা। তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। বড় ঠাকুরকে বলে' তার একদিন চাবুকের ব্যবস্থা কোরো।" চিঠিটা পড়ে মিনার মুখে একটুও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গেল না। সে উত্তরে লিখলে, "তার দরকার হবে না, বৌদি। আমিই তাকে শিক্ষা দেবো।"

(২)

দু'দিন পরে মিনা বৌদিকে পুনরায় চিঠি লিখলে—

—"তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। কাল বিকালে সে এসেছিল। দক্ষিণের পড়বার ঘরটাতে তার জন্যে সত্যিকারের জলখাবার সাজিয়ে রেখেছিলুম। সে তো ঘরে ঢুকে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেছ্‌ল—বসবে কি দাঁড়াবে, নমস্কার করবে কি, না করবে—কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিল না। আমি খাবারের দিকে দেখিয়ে দিতেই সে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে ভোজন সুরু করে দিলে। খাবার সময়ে তার হাতটা মুখে তোলবার ভঙ্গী এবং খাওয়ার ফাঁকে আমার দিকে মাঝে মাঝে মুখ তুলে চাইবার ধরণ—এর মধ্যে কোনটা যে বেশি বিশ্রী ঠেকছিল, তা' বলা বড় শক্ত। আমি তাকে একেবারেই "তুমি" বলে সম্বোধন করে বসলুম। এতে চমকে যেওনা। ও-সম্বোধনটা প্রেমাস্পদেরই একচেটে নয়—বাড়ীর সরকার, লোকজন এবং তাদেরই সমপদস্থ বাইরের লোকেরও ও-সম্বোধনটাতে একটা দাবী আছে। সে আমাকে কিন্তু "তুমি" বলতে সাহস করে নি এবং প্রতি কথার গোড়ায় "আজ্ঞে" বলে ভণিতা করেছিল। হ'রে চাকরের চেয়ে সভ্য বটে—যে "এজ্ঞে" বলে কথা আরম্ভ করে। যাই হোক, তার কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিলুম এবং তাকেও অনেক কথা জানিয়ে দিলুম। তার নাম গোবর্দ্ধন কি জনার্দ্দন, কি ওই রকম একটা কিছু। তবে যে চিঠিতে "দিব্যেন্দুসুন্দর" বলে' সই করা ছিল—তার কারণ আর কিছুই নয়—ক'লকাতার মেয়েরা সে-কেলে নামগুলো পছন্দ করে না বলে'।

আমার সম্বন্ধে তার ইচ্ছাটা ছিল শুভ ;—অর্থাৎ ডাক্তারি কলেজের ছেলে হলেও আমার উপর অস্ত্র-প্রয়োগ করবার ইচ্ছা তার কোন কালেই ছিল না অথবা আমার গয়নাগুলো বিক্রি ক'রে ডাক্তারখানা খোলবার মৎলবও তার মনে কখনো ওঠে নি। আমাকে তার বিয়ে করবারই অভিপ্রায় ছিল। ব্যাপারটা একবার কল্পনা কর দিকিন্। একটা এঁদো গলির ভিতর একখানা ভাঙ্গা বাড়ী—তার মধ্যে এই গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন-নামা স্বামী-দেবতার সঙ্গে আজীবন বাস। হাঁটুর উপর-ওঠা কাপড় পরে' প্রত্যহ তাঁর বাজারে গমন এবং বাজার থেকে ফিরে এসে মুটের সঙ্গে এক পয়সার হিসেব নিয়ে বাকযুদ্ধ!..... তাকে তার সদভিপ্রায়ের জন্য ধন্যবাদ দিলুম। তাকে বললুম বিয়ে হয় কি ক'রে ?—বিধবার বিয়ে হতে গেলেও জাতটা তো ভিন্ন হ'লে' চলবে না। সে বললে—কেন, আপনারা তো আমাদের পালটি ঘর। বললুম—তা' হ'তে পারে ; কিন্তু তবুও তো একজাত নয়। কেন যে নয়, সেটা তাকে বোঝাতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। অবস্থার তফাৎটাই যে আসল জাতের তফাৎ—অন্তত আমার যে তাই ধারণা—তা' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকটির মস্তিষ্কে শেষ পর্য্যন্ত ঢোকাতে পেরেছিলুম কি না সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। সে তো এক মহা বক্তৃতা জুড়ে দিলে—খুব উচ্ছ্বাসময় এবং খুব সম্ভব আগে থাকতে মুখস্থ করা। তার মোদ্দাখানা এই যে, প্রেমেতে ও-সমস্ত বৈষম্য ঢাকা পড়ে' যায়। এ হচ্ছে আসলে যেটা প্রশ্ন, সেটাকে উত্তর বলে মেনে নেওয়া। তবে এ-ক্ষেত্রে ওটা জ্ঞানের অভাব কি প্রেমের স্বভাব—সেটা বুঝতে পারলুম না। বললুম—কাল্-চারের বৈষম্যে প্রেম তো জন্মাতেই পারে না—অন্তত জন্মান উচিত

নয়। সে তখন একটু গরম হয়ে' বললে—"আপনারা আমাদের নিতান্তই অসভ্য বাঙাল, নয় তো পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে' মনে করেন—না ? আমি বললুম—শুধু যে মনে করি তা' নয়, মুখেও বলি। তবে জ্যান্ত মানুষকে "ভূত" না ব'লে "অদ্ভুত" বলি।" সে তখন মহা রেগে উঠেছে। বললে—"আমায় এ-রকম অপমান করবার মানে কি ? আমিও যদি জানিয়ে দি যে আপনি আজ আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেছেন, তাহলে আপনার মুখ থাকে কোথায় ?" এ-ধরণের লোকেদের ভদ্রতার মুখোসটা কত সহজে খসে' পড়ে দেখছ! তার যা' প্রতীকার আমার হাতে ছিল—সেইটে তাকে জানিয়ে দিয়ে বেশ শান্তভাবেই বললুম—"প্রাণী বিশেষকে মারা বড় শক্ত নয় তবে নিজের হাতে গন্ধটা থেকে যায় এবং ও-জাতের গন্ধের উপর আমার একটা চিরকেলে বিতৃষ্ণা আছে। অতএব—।" আর কিছু শোনবার অপেক্ষা না রেখেই সে পলায়ন দিলে। ভাগ্যিস জলখাবারটা খেয়ে গিছ্‌ল—তা' নইলে বেচারার কি কষ্টই হত!"

(৩)

সেই দিনেই মেসে ফিরে এসে দিব্যেন্দুসুন্দর ওরফে গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন সকলকে জানিয়ে দিলে যে, সে তার পরদিনই দেশে ফিরে যাবে কারণ এখানে তার "নোনা" লেগেছে। কলকাতার জল খারাপ, হাওয়া খারাপ, ক'লকাতাটা নরকেরই প্রতিরূপ—ইত্যাদি।

পরদিনেই দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে জানালে যে, সে ক'লকাতা একেবারেই ত্যাগ করে এসেছে। এখানে মাইনর ইস্কুলের একটা মাষ্টারি করে খাবে তবু আর ক'লকাতায় ফিরবে না। সেখানে তার

একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর কি? সে একরকম জোর করেই পালিয়ে এসেছে। ক'লকাতার লোকেরা সব করতে পারে। আর তাদের মেয়েদের তো জান না। তারা সকলেই—ইত্যাদি।"

তার কিছুদিন পরেই ভাজ এসে ননদকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছিস ভাই। লোকটার কি আস্পর্দ্ধা!" ননদ আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু হাসলে, আর সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ল বোধ হয়।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্য-চর্চ্চা।*

(G. Lanson-র ফরাসী হইতে)।

সেকেলে ভূমিকার সরল পন্থানুসরণ করে' আমি এই বই* "যারা পড়ে"—অর্থাৎ যারা আমাদের ফরাসী লেখকদের লেখা পড়ে, তাদের হাতে দিলুম। অল্পবয়সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য যারা সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করে, আমাদের ইস্কুলকলেজের সেই ছাত্রছাত্রীদের, আশা করি, এই বইখানি কাজে লাগবে; বিশেষ করে' এই জন্যই আরও কাজে লাগবে যে, কেবলমাত্র তাদের কাজে লাগবার জন্য, তাদের পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মুখস্থ করবার জন্য, বা তাদের আমোদ দেবার জন্য এ বই লেখা হয় নি। যে ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস সকল শিক্ষিত বা শিক্ষাভিলাষী ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত, যার পাঠে তাদের বিদ্যানুশীলনকে নিঃস্বার্থতর উদারতর করে' তুলবে, এমন একটি বই আমাদের ছাত্রদের হাতে দেওয়ার চেয়ে কি বেশি মহৎ উপকার আমি তাদের করতে পারি তা' ত জানি নে। পরীক্ষার পড়া তৈরি করবার সময় তারা যদি ভুলতে পারে যে তারা পরীক্ষার্থী, যদি কেবল সাহিত্য-চর্চ্চার উদ্দেশ্যেই সাহিত্য-চর্চ্চা করতে পারে, তাহলে তারা পরীক্ষার অতিরিক্ত সাফল্য লাভ করবে।

* ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস।

আমি কি করতে সক্ষম হয়েছি তার বিচারের ভার অন্যের হাতে, আমি শুধু কি করতে চেয়েছি, কোন্ ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে' এই কার্য্যে ব্রতী হয়েছি, তারই হিসাব দিতে পারি।

একালে সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা একটা মস্ত ভুল ধারণা অনুসারে করা হয়। ও-বস্তুর যেন একটা বাঁধা তালিকা আছে, যেটা যেন-তেন-প্রকারেণ যত শীঘ্র সম্ভব আদ্যোপান্ত চোখ বুলিয়ে সাঙ্গ করে' গলাধঃকরণ করা চাই, যাতে "ফেল মার্‌তে" না হয়; তারপরে জন্মের মত তার সঙ্গে এবং আর আর পড়াশুনার সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে শোধবোধ হয়ে' যায়, চিরজীবন আর ভুলেও সেদিকে মন যায় না। এই রকম করে' সব শিখতে এবং সব শেখাতে গিয়ে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞতার ফাঁক না দিলে, ফলে আনুষ্ঠানিক জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু ছাত্রের মনে সাহিত্যের রসবোধ কিছুমাত্র জন্মায় না; সাহিত্য কতকগুলি শুষ্ক তথ্য ও সূত্রের সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়, এবং যে সকল রচনার ব্যাখ্যা তা'তে করা হয়, সেগুলির প্রতি শিক্ষিতদের চিত্তে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা জন্মাবার কথা।

এই গুরুমশায়ী ভ্রান্তিটি আর একটি গভীরতর, ব্যাপকতর ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি অতীব সাংঘাতিক কুসংস্কারবশত সাহিত্যকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা হয়েছে; সাহিত্যের বিশেষ জ্ঞানেরই একটা বিশেষ মর্য্যাদা দাঁড়িয়ে গেছে; এবং এজন্য স্বয়ং বিজ্ঞান কিংবা বৈজ্ঞানিকরাও দায়ী নন। দুঃখের সহিত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, Renan উক্ত ভুল ধারণার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর "বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ" নামক গ্রন্থে তিনি যে কথাটি লিখেছেন, সেটি তাঁর অল্পবয়সের উৎসাহের নিদর্শন বলে',

বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নূতন ব্রতীর অতিশয়োক্তি বলে' মেনে নেওয়াই ভাল। কথাটি এই,—"মানবের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাহিত্য-চর্চ্চার স্থান ভবিষ্যতে অনেকপরিমাণে সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠের দ্বারা অধিকৃত হবে।" এই কথাটি একেবারে সাহিত্য-চর্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত করে। এতে কেবলমাত্র ইতিহাসের একটি শাখারূপে সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়,—তা নীতির ইতিহাসই হোক্, আর ভাবের ইতিহাসই হোক্।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক পাতানো যতটা আবশ্যক, তার ইতিহাস এবং সারমর্ম্মের সঙ্গে তার সিকির সিকিও নয়। চারুশিল্পের ইতিহাস পাঠ করলেই যে ছবি এবং মূর্ত্তি চোখ চেয়ে দেখার কাজ হয়ে যায়, এ কথা বোধ হয় কেউ মানবে না। শিল্পেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা-বিশেষকে বাদ দিলে চলে না; কারণ প্রতি রচয়িতার বিশেষত্ব সেই রচনার মধ্যে নিহিত থাকে, এবং তারই দ্বারা প্রকাশিত হয়। মূল বাক্যাবলীর পাঠে মানুষের মনে ঔৎসুক্য জন্মানো যদি সাহিত্যের ইতিহাসের চরম লক্ষ্য না হয়, তাহলে সে ইতিহাস পাঠে যে জ্ঞানলাভ হয়, সে জ্ঞান যেমন নীরস তেমনি অসার। উন্নতির নাম করে' আমাদের ভোগা দিয়ে মধ্যযুগের সেই জ্ঞানের কার্পণ্যের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যে-সময় এক অঙ্ক এবং সব বিষয়ের সারতত্ত্ব বই লোকে আর কিছু জানত না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মূল গ্রন্থের অনুশীলন এবং টীকা-ভাষ্যের বর্জ্জন দ্বারাই ইতালীয় নবযুগ শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতীত্ব লাভ করেছিল।

অবশ্য আজকালকার দিনে সাহিত্য-চর্চ্চা করতে গেলে পাণ্ডিত্যের

সহায়তা চাই; আমাদের বিচারবুদ্ধির স্থাপনা ও চালনা করবার জন্য কতকপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট এবং নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আর সে-সকল প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়, যার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগপূর্ব্বক আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাবগুলিকে সুসম্বদ্ধ করা, এবং সাহিত্যের গতি, বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু দুটি জিনিস যেন আমরা সর্ব্বদা মনে রাখি—সাহিত্যের ইতিহাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি-বিশেষত্বের বর্ণনা, এবং তার ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অনুভূতি। জীবজগতের কোন-একটি বিশেষ শ্রেণীর জ্ঞানলাভ করা তার লক্ষ্য নয়,—তার লক্ষ্য Corneille, তার লক্ষ্য Hugo এবং যে সব অভিজ্ঞতা ও প্রণালী সকলেরই আয়ত্তাধীন, যার দ্বারা সকলেই সমান ফল পায়, তার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; সিদ্ধ হয় সেই সকল অনুভূতির দ্বারা, যা' মানুষে মানুষে বিভিন্ন, এবং যার ফল আপেক্ষিক ও অনিশ্চিত হওয়া অনিবার্য্য। হিসাবমত ধরতে গেলে, সাহিত্য-জ্ঞানের উদ্দেশ্যই বল, উপায়ই বল, কোনটিই পুরোদস্তর বৈজ্ঞানিক নয়।

শিল্পে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা-বিশেষকে অগ্রাহ্য করলে চলে না; কারণ তার শক্তি ও সৌন্দর্য্য অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট, এবং কেউ বলতে পারবেন না যে তিনি নিঃশেষে তার সারসঙ্কলন করেছেন, কিংবা তাকে ধরবার সূত্র বানিয়েছেন।—অর্থাৎ সাহিত্য একমাত্র জ্ঞানের অধিগম্য নয়; সাহিত্য হচ্ছে চর্চ্চা করবার, উপভোগ করবার জিনিস। ও-বস্তু জানতে হয় না, শিখতে হয় না; তা' সাধনা করতে হয়, অনুশীলন করতে হয়, ভালবাসতে হয়। Descartes সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেইটিই সব চেয়ে সত্য কথা;—ভাল

বই পড়া মানে হচ্ছে সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলা, এবং সে কথোপকথনে তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের শ্রেষ্ঠ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

আমি কোন কোন অঙ্ক-শাস্ত্রীকে জানি, যাঁরা সাহিত্য-চর্চ্চায় আমোদ পান, যাঁরা চিত্তবিনোদনের জন্য নাট্যাভিনয় দেখতে যান, বা একটু ফাঁক পেলেই একখানি বই নিয়ে পড়তে বসেন; আবার এমন সাহিত্যিকও জানি, যাঁরা পড়েন না, কিন্তু সাহিত্যের খোসা ছাড়িয়ে নেন, এবং যা-কিছু ছাপানো জিনিস তাঁদের হস্তগত হয়, তাকে খেলার কড়িতে পরিণত করাই কর্ত্তব্য মনে করেন। এ দুই দলের মধ্যে প্রথমোক্ত দলই সত্যের পথে অধিক অগ্রসর হয়েছেন বলে ত আমার বিশ্বাস। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আমাদের আমোদ দেওয়া; কিন্তু সে আমোদ মানসিক, সে আমোদ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির খেলা হতে উৎপন্ন। এবং তার ফলে সে বৃত্তিগুলি অধিকতর সবল সচল ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। অর্থাৎ সাহিত্য অন্তরের উৎকর্ষসাধনের একটি উপায়,—এই হচ্ছে তার আসল কাজ।

সাহিত্যের একটি মহৎ গুণ এই যে, তার চর্চ্চায় মানুষ ভাব-রাজ্যের সুখাস্বাদনে অভ্যস্ত হয়। তার ফলে মানুষ নিজের বুদ্ধির চালনায় একাধারে সুখ, শান্তি ও সঞ্জীবনী-শক্তি লাভ করে। সাহিত্য সাংসারিক কাজকর্ম্মের অবকাশে মানুষের মনোরঞ্জন করে, এবং জ্ঞান বিজ্ঞান, স্বার্থসিদ্ধি ও বৈষয়িক পক্ষপাতিতার ঊর্দ্ধে মানুষের চিত্তকে উত্তোলন করে;—বিশেষজ্ঞের মনের সংকীর্ণতা দূর করে। একালে উদার সত্যের আলোক বিশেষরূপে আমাদের মনের পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু দর্শনের মূল গ্রন্থের আলোচনা সকলের আয়ত্তাধীন

নয়। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে দর্শনকে ইতর না করে'ও লোকায়ত্ত করে; তাকে মধ্যস্থ করেই আমাদের লোক-সমাজের ভিতর দিয়ে সেই সকল বড় বড় দার্শনিক স্রোত বইতে থাকে, যার দ্বারা সামাজের উন্নতি, অন্তত পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারিত হয়। যে-সকল মানবাত্মা জীবনসংগ্রামে খিন্ন এবং বিষয়ব্যাপারে মগ্ন, সাহিত্যই তাদের অন্তরে সেই সকল উচ্চ সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগরূক রাখে, যেগুলি মনুষ্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তার অর্থ ও লক্ষ্য নিরূপিত করে। আধুনিক কালে অনেকের মনেই ধর্ম্মভাব বিলুপ্তপ্রায় এবং বিজ্ঞান সুদূরবর্ত্তী; একমাত্র সাহিত্যই তাদের কাছে সেই সকল আবেদননিবেদন পৌঁছে দেয়, যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তারা সঙ্কীর্ণ অহমিকা এবং পাশব পেশাদারীর হাত হতে মুক্তিলাভ করে।

অতএব আমি যতদূর বুঝি, সাহিত্য-চর্চ্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের উৎকর্ষসাধন ও চিত্তবিনোদন। অবশ্য শুধু সৌখীন ও সহজভাবে সাহিত্য পাঠ না করে' যাঁরা শিক্ষা দেবার জন্য পাঠ করতে চান, তাঁদের নিজের জ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করতে হবে, ব্যবস্থাপূর্ব্বক বিদ্যানুশীলন করতে হবে, অপেক্ষাকৃত নির্দ্দিষ্ট, নির্ভুল, এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই অধ্যয়ন করতে হবে, তা' স্বীকার করি। কিন্তু দুটি জিনিসের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা চাই;—একটি হচ্ছে এই যে, তিনিই সাহিত্যের সদ্‌গুরু, যিনি শিষ্যের মনে প্রধানত সাহিত্যরস উপভোগ করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে উদ্যোগী হবেন, ও তাদের মনের গতি এমন দিকে ফেরাতে পারবেন যাতে চিরজীবন তারা সাহিত্যকে একদিকে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন, অপরদিকে কর্ম্ম-জীবনের অবকাশের নর্ম্ম-সচিবস্বরূপ মনে করবে। এই

গন্তব্যস্থানে পৌঁছনোই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত,—কেবল তাদের পরীক্ষার দিনের উপযোগী কাটাছাঁটা উত্তর যোগানো নয়। আর একটি স্মর্ত্তব্য কথা হচ্ছে এই যে, কেউ তাঁর শিক্ষাকে এইপ্রকারে সফল করে' তুলতে সক্ষম হবেন না, যদি তিনি পণ্ডিত হবার আগে নিজেই সখের সাহিত্যিক না হ'য়ে থাকেন; আজ যে সাহিত্যকে অপরের উন্নতিসাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করছেন, এক সময়ে সেটিকে যদি তিনি নিজের উৎকর্ষসাধনের কাজে না লাগিয়ে থাকেন; সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে যা-কিছু অনুসন্ধান, যা-কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন, সে সব যদি তিনি নিজেই আরও ভাল করে' বোঝবার উদ্দেশ্যে, বুঝে আরো বেশি উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে না করে' থাকেন। সুতরাং আমার এই গ্রন্থপাঠ সাহিত্যের মূল রচনাবলী পাঠকে অনাবশ্যক করে তুলবে না, বরঞ্চ সাহিত্যপাঠের নিমিত্তকারণ হবে; কৌতূহল নিবৃত্ত করবে না, বরঞ্চ উদ্রেক করবে,—এই আমার অভিপ্রায়; এবং এই উদ্দেশ্য অঙ্গীকার করেই আমি ফরাসী-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

* * * * *

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি নতুন কথা বলবার জন্য বা নতুন কিছু আবিষ্কার করবার জন্য ব্যস্ত হই নি; এবং আমার সমসাময়িক অধিকাংশ পাঠকের মনে যে লেখা পড়ে' যে ভাব উদয় হয়ে থাকে, মোটামুটি সেই সকল ধারণাই আমারও মনে জন্মেছে,—এই কথা জানতে পারলে আমি যেমন কৃতার্থ হব, এমন আর কিছুতে নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

দ্বি-ইয়ারকি

—:০:—

শ্রীমতী.....দেবী

করকমলেষু—

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে' আসছি যে খবরের কাগজ তুমি নিত্য পড় আর সেই সঙ্গে নিত্য ভ্রূ-কুঞ্চিত কর। তোমার এহেন অপ্রসন্ন হবার কারণ আমি তোমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করি নি, কারণ জানি যে কাগজ পড়াটা তুমি একটা দৈনিক কর্ত্তব্যের হিসেবে দেখো। আর দৈনিক কর্ত্তব্য মাত্রেই বিরক্তিকর, যথা—আমাদের আপিসে যাওয়া।

কিন্তু কাল তোমার মুখে শুনলুম যে, তোমার ব্যাজার হবার এদানিক একটু বিশেষ কারণ ঘটেছে। তুমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছ যে খবরের কাগজ নিত্য এক কথা লেখে, তাও আবার প্রায় একই ভাষায়; শুধু তাই নয়, কাগজওয়ালাদের যত বকাবকি যত রোখারুখি কিছুদিন ধরে সব নাকি হচ্ছে একটা কথা নিয়ে এবং সে কথাটা হচ্ছে diarchy; অথচ ও-কথার মানে জানা দূরে থাক্ নামও তুমি ইতিপূর্ব্বে শোন নি, যদিচ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তোমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও-কথার অর্থ যে জানা তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। দুদিন আগে আমরাও কেউ জানতুম না। কথাটা গ্রীক কিন্তু জন্মেছে ভারতবর্ষে। Monologue-এর

সঙ্গে dialogue-এর যা প্রভেদ, মূলত monarchy-র সঙ্গে diarchy-রও সেই প্রভেদ—অর্থাৎ একের সঙ্গে দুয়ের যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ। এখন বুঝলে ত?

তুমি যদি মনে ভাব বুঝেছ, ত ঠকেছ। ঐ diarchy-র মূল অর্থ ভুল অর্থ। সে অর্থের সঙ্গে তার হাল অর্থের সম্পর্ক এক রকম নেই বললেই হয়। অভিধানের ভিতর থেকে ওর মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ওর অর্থের খোঁজ নিতে হবে এক সঙ্গে হিস্টরি এবং জিওগ্রাফির কাছে। ইউরোপের হিস্টরি আর ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি এই দুয়ের মিলনের ফলে এই diarchy জন্মলাভ করেছে। ঐ কথাটার জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তুমি ওর রূপগুণের পরিচয় পাবে।

(২)

এদেশে কিছুকাল থেকে একটা পলিটিক্যাল-মামলা উঠেছে যার নাম হচ্ছে Democracy *vs.* Bureaucracy, এ ক্ষেত্রে বাদী হচ্ছে স্বদেশী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর প্রতিবাদী হচ্ছেন বিদেশী শাসক সম্প্রদায়। উভয় পক্ষের ভিতর অনেক তর্কাতর্কি চটাচটি এমন কি সময়ে সময়ে গুতোগুতি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, শেষটা এ মামলার বর্ত্তমানে যেটা সর্ব্ব-প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে তারি নাম হচ্ছে diarchy. বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এখন এই মামলার শুনোনি হচ্ছে, তাতে দু-পক্ষই কসে' সওয়াল-জবাব করছেন। উভয় পক্ষই যে এক কথা একশ-বার বলছেন, তার কারণ আমরা যাকে ওকালতি বলি—সে হচ্ছে এক কথা একশ' রকমে বলবার বিদ্যে।

এই মামলাটার আসল হাল বুঝতে হলে' ইউরোপের ইতিহাসের অন্তত মোটামুটি জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক। তাই আমি সে ইতিহাসের সারমর্ম্ম যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি যে দু'কথায় তা হবে না।

ইউরোপীয়দের মতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম কথাও যা আর তার শেষ কথাও তাই, সে কথা হচ্ছে democracy,—ও-শব্দ যে গ্রীক তার থেকেই অনুমান করা যায় যে, ঐ হচ্ছে ইউরোপের সভ্যতার গোড়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুমানের কোনও প্রয়োজন নেই, কেননা এর প্রমাণ আছে। গ্রীসের ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই যে গ্রীসের শাসনতন্ত্র সাধারণত লোকমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে শাসনতন্ত্রের নাম হচ্ছে democracy. Demos শব্দের মানে তুমি অবশ্য জানো, কেননা এদেশে democracy-র সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও—দু'-চারজন demagague-এর সঙ্গে ত আছেই। তারপর রোমক সভ্যতাও ঐ democracy-র উপরেই দাঁড়িয়েছিল। রোম যে-দিন থেকে তার republic খুইয়ে সম্রাটের অধীন হন সেইদিন থেকেই তার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। রোমক-সাম্রাজ্যের ইতিহাস যে, তার Decline এবং fall-এর ইতিহাস—এ সত্যের সাক্ষাৎ ত আমরা Gibbon-এর বইয়ের মলাটেই পাই।

(৩)

"ডিমোক্রাসি" ইউরোপের ইতিহাসের প্রথম কথা আর শেষ কথা হলেও এর মধ্যের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। ইউরোপের মধ্যযুগ একালের

ইউরোপীয়দের মতে উক্ত মহাদেশের সভ্যতার নয়—অসভ্যতার যুগ। রোমক-সাম্রাজ্য যতই জরাজীর্ণ হোক্ না কেন,—আরও বহুকাল টিঁকে থাকত, বাইরে থেকে বর্ব্বররা এসে যদি না তা সমূলে ধ্বংস করত। গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ত বড় জিনিস, এই বর্ব্বরেরা কোনরকম সভ্যতারই ধার ধারত না, সুতরাং তারা ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা একঘায়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে এবং রোম সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে নিজেরা ভোগ দখল করতে লাগল। ফলে যে নূতন তন্ত্র সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করে বসলে, তার নাম হচ্ছে Feudalism. এই Feudalism ব্যাপারটা যে কি তা একটা ঘরাও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ-কথা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, এক সময়ে বাঙলা দেশে বারোজন ভুঁইঞা ছিলেন। এই দ্বাদশ ভূম্যধিকারী যে এ-দেশের শুধু জমিদার ছিলেন তাই নয়—তাঁরা এক একজন ছিলেন এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। আমরা জমিদারদের চিঠি লিখতে হলে আজও শিরোনামায় লিখি "প্রবল প্রতাপেষু"। মধ্যযুগে ইউরোপ ঐ শ্রেণীর এক ডজন নয়, শতশত ভূম্যধিকারীর অধীন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের এ যুগের ইতিহাস হচ্ছে এদেরই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ইতিহাস। এই কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ফলে, ইউরোপে শেষটা কতগুলি বড়বড় রাজ্য দাঁড়িয়ে গেল। সে রাজ্যগুলি আজ প্রায় সবই বজায় আছে।

ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিও যেমন ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইংলণ্ডের হিস্টরিও তেমনি বিভিন্ন। প্রথমত দ্বিপা হবার দরুণ ইউরোপের কোন দেশের সঙ্গে তার কস্মিনকালেও সীমানাঘটিত বিবাদ ঘটে নি। আর মধ্যযুগের যত ভূম্যধিকারী-রাজাদের পরস্পরের যত মারামারি

হত তা ঐ চৌহদ্দি নিয়ে। প্রকৃতি যেমন ইংলণ্ডকে একদেশ করে গড়ে দিলেন, William the Conqueror-ও তেমনি একদিনে এ দেশকে এক রাজ্য করে তুললেন। সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুগযুগ ধরে কাটাকাটি করে' ইংলণ্ডের রাজাকে একরাট হতে হয় নি। এই কারণে ইংলণ্ডের ইতিহাসের ধারাও একটু স্বতন্ত্র। রাজায় সামন্তে জমি নিয়ে লড়ালড়ি নয়, রাজায় প্রজায় রাজশক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির ইতিহাসই হচ্ছে ইংলণ্ডের আসল ইতিহাস।

মধ্যযুগের অবসানে যখন আমরা বর্ত্তমান যুগের মুখে এসে পৌঁছই তখন দেখতে পাই যে ইউরোপ কতগুলি ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত, এবং প্রতিদেশের মাথার উপর বসে আছেন এক এক জন সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা,—যিনি হচ্ছেন সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সর্ব্ব রাজশক্তির একমাত্র আধার। এ রাজশক্তি সংযত করবার ক্ষমতাও কারো ছিল না, কেননা এ শক্তি সেকালের মতে ছিল—ভগবদ্দত্ত, সুতরাং তার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার মানুষের ছিল না। ইতিমধ্যে ইউরোপের সকল জাতিই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিল, এবং সেই ধর্ম্মের প্রসাদে তারা বিশ্বরাজ্যে যে একেশ্বরের সন্ধান পেয়েছিল, প্রতি রাজা নিজ নিজ রাজ্যে তদনুরূপ একেশ্বরের পদ লাভ করেছিলেন অর্থাৎ তাঁরা প্রতিজন হয়ে উঠলেন, স্বরাজ্যের অদ্বিতীয় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। Monarchy, অবশ্য প্রাচীন গ্রীসেও ছিল, কিন্তু ইউরোপের এই নব monarchy-র তুলনায় সে হচ্ছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তার পিছনে না ছিল এতাদৃশ ধর্ম্মবল, না ছিল এতাদৃশ বাহুবল।

(৪)

যে ডিমোক্রাসি মধ্যযুগে একদম ছাই চাপা পড়ে গিয়েছিল, বর্ত্তমানে তা আবার ইউরোপে সদর্পে জ্বলে উঠেছে। এ যুগের ইউরোপীয়রা এ ছাড়া যে অপর কোনও শাসনতন্ত্র সভ্যজগতে গ্রাহ্য হতে পারে এ কথা মুখে আনলেও কানে তোলে না। এ বিষয়ে পরস্পরে যে মতভেদ আছে সে শুধু তার বাহ্য আকার নিয়ে। শাসন যন্ত্রটা কি ভাবে গড়লে ডিমোক্রাসি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে, এমন কি জাতিতে জাতিতে মতান্তর হয়। এক কথায় ডিমোক্রাসির ধর্ম্ম সবাই মানেন, যা কিছু সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে সে শুধু তার Church নিয়ে, সে Church-এর মাথায় জনৈক ধর্ম্মরাজ, কিম্বা পঞ্চায়েৎ থাকা শ্রেয়; এ নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই। এ তর্কের শেষ কস্মিনকালে যে হবে তারও আশা করা যায় না, কেননা মানুষের রুচিও ভিন্ন আর তর্ক করবার প্রবৃত্তিও অদম্য।

সে যাই হোক্ ইউরোপের এই নব-ডিমোক্রাসি ও তার প্রাচীন ডিমোক্রাসি এক বস্তু নয়, এদের পরস্পরের আত্মাও বিভিন্ন;—এ দুয়ের ভিতর যে আশমান জমিন ফারাক্ এমন কথা বললেত অত্যুক্তি হয় না।

ইউরোপের পণ্ডিতদের মতে সে দেশের সভ্যতা হচ্ছে Antico-modern, অর্থাৎ—ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের পাতা ক'টা প্রক্ষিপ্ত, আর সেই প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু ছেঁটে ফেললেই তার অতীত তার বর্ত্তমানের সঙ্গে জুড়ে যায়, আর তখন দেখা যায় যে ইউরোপ আসলে গ্রীকো-রোমান সভ্যতারই জের টেনে আসছে।

এ মতটা অবশ্য সত্য নয়। দু'হাজার পাতার ইতিহাসের মধ্যে থেকে যদি হাজার পাতা ছিঁড়ে ফেলা যায়, তাহলে তার যে অঙ্গহানী হয় এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। বর্ত্তমান ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের যোগ আছে শুধু বইয়ের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ সে যোগ হচ্ছে বিদ্যাবুদ্ধির যোগ; কিন্তু তার নাড়ীর যোগ আছে শুধু মধ্যযুগের সঙ্গে।

জের, ইউরোপ আজও মধ্যযুগেরই টানছে। বকেয়ার মায়া কেউ বা বেশি কাটিয়েছে কেউ বা কম, সে দেশে এ যুগে জাতিতে জাতিতে মনের তফাৎ এই মাত্র। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষের যে আত্মা গড়ে উঠেছে, সেই আত্মা হচ্ছে এই নব-ডিমোক্রাসির আত্মা। আর ঐ মধ্যযুগে ও-দেশে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সেই রাষ্ট্রই এই নব ডিমোক্রাসির দেহ।

এই নব-মানবধর্ম্মের বীজ-মন্ত্র যে liberty, equality এবং fraternity—এ কথা ত এ দেশের স্থূলবয়রাও জানে। Liberty শব্দ যে-অর্থে আমরা বুঝি সে-অর্থে প্রাচীন ইউরোপ বুঝত না, liberty শব্দের এ-কেলে অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সে-কালে State-এর বহির্ভূত ব্যক্তিত্বের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তারপর দাস প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন সভ্যতার ধর্ম্মই ছিল অধিকারী ভেদ আর এ অধিকারী ভেদ ছিল জাতিভেদেরই একটি অঙ্গ। যারা জাতিতে গ্রীক কিম্বা রোমান নয় তারা সকল রাজনৈতিক অধিকারে সমান বঞ্চিত ছিল। রোম শেষটা অবশ্য—রোমক-সাম্রাজ্যের অধিবাসী মাত্রকেই রোমের নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতে সুরু করেছিল, কিন্তু সে হয়েছিল তখন যখন সে সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা

উপস্থিত। এবং তার কারণ সে অবস্থায় রোমান নামক একটা বিশেষ জাতির কোন অস্তিত্বই ছিল না। রোম সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করেছিল, তার ফলে সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীরাও রোমানদের গ্রাস করে ফেলে। সুতরাং equality বলতে এ-কালের লোক যা বোঝে সে-কালের লোক তা বুঝত না। এসিয়ার ধর্ম্ম যদি ইউরোপের মনে বসে না যেত তাহলে liberty, equality প্রভৃতি শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থের সন্ধান ইউরোপ পেত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে যে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে হচ্ছে এই যে, ইউরোপ যুগ যুগ ধরে খৃষ্টধর্ম্মের বশীভূত না হলে তার মুখ দিয়ে Fraternity শব্দ কখনই বার হত না। নব-ডিমোক্রাসির মুখে এ কথাগুলি শুধু শাসন-তন্ত্রের মূল সূত্র নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের সাধন-মন্ত্র। গ্রীকো-রোমান সাহিত্যের প্রভাবে, ইউরোপের এই উদ্বুদ্ধ আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তি-জ্ঞানে রূপান্তরিত হল। ইউরোপ আত্মবলে স্বর্গরাজ্য জয় করবার দুরাশা ত্যাগ করে, পৃথিবী জয় করতে উদ্যত হল। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যার আসন নবযুগের বিজ্ঞান অধিকার করে বসলে।

(৫)

ডিমোক্রাসির আত্মাকে অব্যাহতি দিয়ে এখন তার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।

প্রাচীন ইউরোপের ডিমোক্রাসি সব এক একটি ছোট সহরকে অবলম্বন করে' তার গণ্ডীর মধ্যেই কায়েম ছিল। এবং সে সকল সহরের, আদ্-বাসিন্দারা নিজেদের সব এক বংশের লোক মনে করত।

তারা সকলে পরস্পর যে পরস্পরের, জ্ঞাতি না হোক্ অন্তত যে স্বগোত্র সে বিষয়ে তাদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সে কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম কুলাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সহরের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে সকল নাগরিকদের মতই নেওয়া হত। নাগরিক মাত্রেরই ভোট ছিল, কিন্তু অ-নাগরিকের এ-বিষয়ে কথা কইবার কোন অধিকারই ছিল না। নাগরিকরা মাথা-গুণতিতে অতি স্বল্পসংখ্যক ছিল বলে' সকলে একত্র হয়ে তাদের পুরী-রাজ্যের ছোট বড় রাজকার্য্য সব চালাতে পারত। অর্থাৎ সে-কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম পারিবারিক-পঞ্চায়েৎ।

এ-কালের রাজ্য কিন্তু একটা সহরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, এক একটা প্রকাণ্ড দেশ জুড়ে' তা বসে আছে। আর এই সব দেশে এক কুলের ত দূরে থাক্, একজাতির লোকও বাস করে না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে এক-দেশীমাত্রেই পলিটিক্যাল হিসাবে একজাতি। এক কথায় এ যুগে স্বদেশীতে আর স্বজাতিতে কোনই তফাৎ নেই। সে-কালের রাজারা ছিলেন নৃপতি আর এ-কালের রাজারা হচ্ছেন ভূপতি। এ পরিবর্ত্তন ঘটেছে মধ্যযুগে। মনে রেখো, মধ্যযুগের সামন্তরাজারা ছিলেন সব ভূম্যধিকারী, সাদা কথায় জমিদার। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে দেখতে পাই ইউরোপের প্রতি রাজা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভূত সমগ্র দেশটাকে নিজের জমিদারী মনে করতেন। এরই ইংরাজি নাম হচ্ছে territorial sovereignty, আর রাজত্বের এই নূতন আইডিয়া থেকে একালের ডিমোক্রাসিতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে প্রজামাত্রকেই ভোট দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধি-কারভেদ একালে কে কত খাজনা দেয় তার উপর নির্ভর করে, কে

কোন্ দেবতা মানে তার উপর করে না। এ কালের রাজশক্তি আকাশ থেকে নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়েছে। ফলে একালে এত অসংখ্য লোকের ভোট আছে যে, সকলে একত্র হয়ে, দেশের রাজ-কার্য্য চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং একালে দেশের লোক তাদের শুধু জনকতক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। সেই প্রতিনিধি-সভাই রাজকার্য্য চালায়। এরি নাম representative গভর্ণমেণ্ট। ইউরোপের সেকেলে আর একেলে ডিমোক্রাসির প্রভেদটা এত লম্বা করে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য, এই কথাটা পরিষ্কার করা যে নব ডিমোক্রাসির গোড়া-পত্তন যেমন এদেশের অতীতেও হয় নি তেমনি সে দেশের অতীতেও হয় নি। এ-বস্তু আমাদেরও অন্বয়া-গতসম্পত্তি নয়, তাদেরও নয়। প্রাচীন আথেন্স রোমের মত স্বরাট সহর প্রাচীন ভারতবর্ষেও একটি আধটি নয়, একশ' দুশ' ছিল। নব ডিমোক্রাসির সূত্রপাত সব প্রথম ইংলণ্ডেই হয়, একমাত্র ইংরাজ জাতিরই এ বিষয়ে একটা পাঁচ ছশ' বছরের tradition আছে, কিন্তু সে tradition আজ দেড়শ' বছর আগে ইউরোপ্ মহাদেশের কোন জাতেরই ছিল না। এই কারণে ফরাসী-বিপ্লবের নেতারা যখন Constitution গড়তে বসেন তখন Arthur Young নামক জনৈক ইংরেজ বলেন এ হচ্ছে পাগলামি, কেন না ফরাসী জাতের ভিতর এ বিষয়ে পাঁচশ' বছরের পুরোনো কোনো tradition ছিল না। এর উত্তরে ফরাসীরা যে বলেন তবে কি আমাদের আর পাঁচশ' বছর হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে? Arthur Young-এর সেই পুরোনো কথা আজ সহস্র ইংরাজ-কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের জবাবও ফরাসীদের সেই পুরানো জবাব। খাঁটি ইংরাজের মনোভাব এই

যে পৃথিবীর অপর সকল জাতি যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের পক্ষে ইংরাজ জাতির হিস্টরির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ কথা বলাও যা আর এ কথা বলাও তাই যে, পৃথিবীর অপর সকল দেশ যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের দেশের জিওগ্রাফিকেও ইংলণ্ডের জিওগ্রাফির অনুরূপ করতে হবে। ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিই যে ইংলণ্ডের হিস্টরি গড়েছে এ ত ইংলণ্ডের পণ্ডিতদের মত।

(৬)

এই নব-ডিমোক্রাসির জন্মদাতা যে ফরাসী-বিপ্লব, এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

এস্থলে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার যে ইংলণ্ডের ইতিহাস এর স্রষ্টা নয় কেন? যে পার্লিয়ামেণ্টরি গভর্ণমেণ্ট ডিমোক্রাসির দেহ তা ত ফরাসী-বিপ্লবের বহুপূর্ব্বে গড়ে' উঠেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ডিমোক্রাসির দেহ ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সে দেশের লোক তার আত্মার সঠিক সন্ধান পায় নি। ফলে ইংলণ্ডবাসীরা এ বিষয়ে সব দেহাত্মবাদী হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে উক্ত দেহের অতিরিক্ত কোনও আত্মা নেই। গভর্ণমেণ্ট ভাবের জিনিস নয় কাজের জিনিস। আর যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তারা গড়ে তুলেছে সে ব্যবস্থার সার্থকতা শুধু ইংলণ্ডেই আছে অপর কোথায়ও নেই। এক কথায় লোকায়ত্ত শাসন-প্রণালী ইংরাজ জাতির একায়ত্ত।

অপর পক্ষে ফ্রান্স স্বদেশে ডিমোক্রাসির যন্ত্র গড়বার পূর্ব্বেই তার মন্ত্রের সৃষ্টি করলে, যে-মন্ত্র আজ পৃথিবী শুদ্ধ লোক আওড়াচ্ছে।

ফ্রান্সের কথা এই যে, মানুষ মাত্রেরই কতকগুলো জন্মসুলভ অধিকার আছে এবং সেই সব অধিকার বজায় রাখাই হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। নব-ডিমোক্রাসির মূল সূত্রগুলি এই —

1. Men are born and remain free and equal in their rights.

2. The rights are liberty, ownership of property, security, and resistance to oppression. Liberty consists in being able to do anything which is not injurious to others.

3. The principle of all sovereignty rests in the nation.

4. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to co-operate personally or through their representatives in its formation. The law should be the same for all."

এই কথাগুলি পৃথিবী শুদ্ধ লোকের মনে বসে গেল, বিশেষত তাদের মনে, যারা উক্ত সকল অধিকারে বঞ্চিত। এ সব কথায় বিশ্বমানবের মন যে, এক সঙ্গে সাড়া দিলে ও সায় দিলে, তার কারণ, ফরাসি জাতি এ সব অধিকার শুধু নিজেদের জন্য নয়, জাতি দেশ বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে মানুষ মাত্রেরই জন্য দাবী করেছিল। এক কথায় ফ্রান্স পৃথিবীতে এক নতুন ধর্ম্ম মত প্রচার করলে। এ ধর্ম্মের মুক্তি পারত্রিক নয়, ঐহিক সমগ্র ইউরোপের জনগণ এই মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত এবং সেই সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। অপর

সকল ধর্ম্মের মত এই ধর্ম্মের dogma-গুলির উপরে লজিকের ছুরি অবশ্য চালানো যায়, এবং সে ছুরি চালাতে ইউরোপের পণ্ডিত-মণ্ডলী, বিশেষত জর্ম্মানরা মোটেই কসুর করেন নি। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত বই লেখা হয়েছে, তা একত্র করলে বোধ হয় একটা নতুন আলেকজাণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরি তৈরি করা যায়—যা ভস্মসাৎ করলে মানুষের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। পণ্ডিতের তর্ক পণ্ডিতে করে' চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষে এই ধর্ম্মমত অনুসরণ করে এক নব-সভ্যতা গড়ে চলেছে—যার নাম হচ্ছে ডিমোক্রাসি। লজিকের ছুরি এ dogma-গুলোকে যখম করলেও তার প্রাণবধ করতে পারে নি, তার কারণ এর একটিও axiom নয়; সব postulate. এ যুগের ফ্রান্সের একটি বড় দার্শনিক, কিছুদিন হল আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের অন্তরে একরকম অশরীরি শক্তি আছে, যার নাম idea-force, যার বলে, মানুষে তার সমাজ গড়ে, সভ্যতা গড়ে। Liberty, equality ও fraternity-র তুল্য প্রবল idea-force যে এ যুগে আর কিছু নেই, তার প্রমাণ গত দেড়শ' বৎসরের ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। এই সব আইডিয়া যখন মানুষের স্বার্থের সঙ্গে একজোট হয় তখন তার শক্তি যে কি রকম অদম্য হয়ে ওঠে, তার পরিচয় ত গত যুদ্ধেই পাওয়া গেছে।

(৭)

অশরীরি আত্মা যতক্ষণ না একটা দেহের ভিতর প্রবেশ করতে পারে ততক্ষণ তার একটা স্থিতভিতও হয় না, আর তা পৃথিবীর কোন কাজেও লাগে না। সুতরাং নব-ডিমোক্রাসির আত্মা ফ্রান্সে

জন্মগ্রহণ করে' ইংলণ্ডের তৈরি দেহকে আশ্রয় করলে। এক কথায় ইংলণ্ডের শাসন-যন্ত্রের অনুকরণে তারা তাদের দেশের শাসনযন্ত্র গড়লে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে, রাজ-বিদ্রোহী ফ্রান্স যে, Constitution তৈরি করলে তার আদর্শ হল ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট। এ নকল করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। প্রথমত সে সময় লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্র এক ইংলণ্ড ব্যতীত আর কোথায়ও ছিল না। দ্বিতীয়ত—যে সব আইডিয়ার উপর ফ্রান্সে তার নবমানব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করলে সে সব আইডিয়ারও সূত্রপাত হয়েছিল ঐ ইংলণ্ডেই। ইংলণ্ড আগে আইডিয়া গড়ে' তারপর সেই আইডিয়া অনুসারে তার গভর্ণমেণ্ট গড়ে নি। কিন্তু সেই গভর্ণমেণ্টের অন্তরে যে সব আইডিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করছিল, যে সব পলিটিক্যাল-আইডিয়া ইংলণ্ডের মগ্নচৈতন্যের ভিতর লুকিয়ে ছিল, ফ্রান্সের দার্শনিকরা সেইগুলি টেনে বার করে, জাগ্রতচৈতন্যের দেশে তাদের খাড়া করলেন। সত্য কথা বলতে গেলে Hobbes, Lock প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকরাই এ সব আইডিয়া প্রথমে আবিষ্কার করেন, Montesquie, Rousseu—প্রভৃতি সেইগুলিকে শুধু ফুটিয়ে তোলেন এবং তাদের একটা নতুন দিক্ আর নতুন গতি দেন। ইংলণ্ড যা তার খানদানি জিনিস মনে করত, ফ্রান্স তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি বলে প্রচার করলে। এই যা তফাৎ, কিন্তু এ তফাৎ মস্ত তফাৎ। ইংলণ্ডের হাতে যা কর্ম্মমাত্র ছিল, ফ্রান্সের হাতে পড়ে' তা ধর্ম্ম হয়ে উঠল।

(৮)

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে, Rights of Man-এর যে চারটি

মূলসূত্রের পরিচয় দিয়েছি, তার প্রথম দুটির বিষয়ের সঙ্গে শেষ দুটির বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম দুটির সার কথা হচ্ছে, গভর্ণমেণ্ট মাত্রেরই পক্ষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য আর শেষ দুটির সার কথা হচ্ছে, সর্ব্বলোকের সমবেত ইচ্ছার উপরই প্রতি দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের গড়নের কথা, আর একটি হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের সার্থকতার কথা। যে diarchy-র নাম শুনে শুনে তোমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে তার মানে বুঝতে হলে, গভর্ণমেণ্টের গড়নের কথাটাই মোটামুটি বুঝতে হবে, কেননা মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড-কল্পিত Reform Bill-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ দেশের শাসন-যন্ত্রটা নতুন করে গড়া। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের কথাটা এখন মুলতুবি রাখা যাক্, কেননা তা হলে Reform Bill-এর নয় Rowlat Act-এর আলোচনা করতে হয়, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র বিষয়। নব ডিমোক্রাসির উক্ত সূত্রগুলির একটির সঙ্গে আর একটির যে যোগ নেই, তা নয়। তবে ইউরোপের লোকের বিশ্বাস যে শাসনযন্ত্রটা লোকায়ত্ত না হলে লোক সমূহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব, সুতরাং ডিমোক্রাসির প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ডিমোক্রাটিক গভর্ণমেণ্টের স্থাপনা করা। এ মতে Reform Bill পাশ হলে আর Rowlat Bill পাস হতে পারে না। সর্ব্বলোকের সম্মতিক্রমে যদি আইন গড়তে হয়, তাহলে সর্ব্বলোকের অসম্মতিক্রমে কোনও আইন তৈরি হতে পারে না। আর সামাজিক জীব যাকে স্বাধীনতা বলে, তা একমাত্র আইনের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের দ্বারাই রক্ষিত, অতএব স্বেচ্ছায় আইন গড়বার অধিকার হচ্ছে সমাজের সব অধিকারের মূল।

(৯)

এই খানে বলে' রাখি যে Representative Government হচ্ছে ডিমোক্রাসির প্রথম কথা, আর responsible Government তার শেষ কথা। এই কথা দু'টোর মোটামুটি অর্থ এখন তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। ব্যাপারটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়, বিশেষত তোমাদের পক্ষে, কারণ আসলে ও হচ্ছে সামাজিক ঘরকন্নার কথা। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের উদাহরণ নেওয়াই সঙ্গত, কেননা ফ্রান্স তার নব-শাসনতন্ত্র কতকগুলো স্পষ্ট principle-এর উপরে একদিনে খাড়া করেছে; সুতরাং সে শাসনতন্ত্রের মূল উপাদানগুলি ধরা সহজ। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বহুকাল ধরে ধীরে-সুস্থে হাত-আন্দাজে গড়ে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স তার প্রজাতন্ত্র একদম নতুন করে গড়েছে, ইংলণ্ড তার সেকেলে রাজতন্ত্র ক্রমান্বয় এখানে ওখানে মেরামত করে' করে' তার হাল শাসনযন্ত্র লাভ করেছে। অবশ্য এই মেরামতের প্রসাদে তার সেকেলে গভর্ণমেণ্টের খোল এবং নইচে দুই-ই বদল হয়ে গেছে।

তা ছাড়া ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্টের লিখিত আইন আছে, ইংলণ্ডের নেই। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মূল, আইন নয়—আচার; সুতরাং তার ভিতর আগাগোড়া মিল পাবে না। ইংলণ্ডের পলিটিক্যাল ধর্ম্মও হচ্ছে একরকম protestantism—অর্থাৎ মধ্যযুগের রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যুগে যুগে প্রতিবাদ করে' সে শক্তিকে ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ করে' হরণ করে' অহরণ করে' ইংরাজেরা তাদের Constitutional monarchy দাঁড় করিয়েছে। রাজা কি কি করতে পারবেন না,

সেই বিষয়েই তারা রাজার কাছে সব লেখা পড়া করে নিয়েছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য এবং মানুষের সহজ অধিকার সম্বন্ধে তাদের Constitution নীরব। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নব-ডিমোক্রাসির ভিত্তি, ইংলণ্ডের আইন-কানুনে তার নাম পর্য্যন্ত নেই। অথচ ও-স্বাধীনতা ইংরাজের মত আর কোনও জাতের নেই। রাজশক্তিকে আইনে বেঁধে এ স্বাধীনতা তারা পরোক্ষ ভাবে লাভ করবে।

"No man can be accused, arrested or detained in prison except in cases determined by law, and according to the forms prescribed by law"—

Declaration if Rights of Man-এর এই সূত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন কথা, এর সাক্ষাৎ Magna charta-তেই পাবে। ইংলণ্ড তার সকল মন ব্যক্তিগত সত্বস্বামিত্ব রক্ষার উপরেই নিয়োগ করাতে, সে দেশের Constitution ইংরাজেরা অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবে গড়ে' তুলেছিল। ফলে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট, গড়নে কতকটা English Church-এর অনুরূপ—অর্থাৎ নূতনে পুরাতনে যোড়া-তাড়া দিয়ে তা খাড়া করা হয়েছে। এক কথায় Reason এবং authority,—এই দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তুর এক রকম কাজ চালানো-গোছ সমন্বয়ের উপর ইংলণ্ডের মন ও জীবন দুই-ই সমান প্রতিষ্ঠিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স যখন তার নব Constitution গড়তে বসল, তখন তার চোখের সুমুখে ঐ ইংলণ্ডের Constitution ছাড়া ডিমোক্রাসির আর কোনও জ্যান্ত নমুনা ছিল

না। ফ্রান্স অবশ্য তার নূতন গভর্ণমেণ্ট, একমাত্র Reason-এর উপরেই খাড়া করতে চেয়েছিল, তা সত্ত্বেও যে ইংলণ্ডের মডেল গ্রাহ্য করতে তার আপত্তি হল না, তার কারণ ইতিপূর্ব্বে জনৈক ফরাসি দার্শনিক, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত reason আবিষ্কার করেছিলেন। Montesquie-র মতে রাজশক্তি সর্ব্বত্র ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেই আবির্ভূত হয়। এর একটির কাজ হচ্ছে—বিচার (Judicial), আর দ্বিতীয়টির আইন গড়া (Legislative), আর তৃতীয়টির শাসন সংরক্ষণ (Executive).

Montesquie-এই মত প্রচার করেন যে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে বিচারের ক্ষমতা রাজার নিয়োজিত জজের হস্তে ন্যস্ত, আইন গড়বার ক্ষমতা সে দেশে আছে শুধু পার্লিয়ামেণ্ট অর্থাৎ প্রজাবর্গের প্রতিনিধির হাতে, আর শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা চিরদিনই রাজার হাতে রয়ে গিয়েছে। Montesquie-র এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাজশক্তির কোন্ অংশ যে কার হাতে ছিল তা বলা অসম্ভব, কেননা এ বিষয়ে তখন কোন একটা লিখিত-পড়িত ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় নি। আসল কথা এই যে রাজা ও প্রজার অধিকারের পাকা-পোক্ত সীমানা তখনও ঠিক হয়ে যায় নি, এমন কি আজও হয় নি। এর ভিতর যে-শক্তি যখন প্রবল হ'ত তখনই সে শক্তি তার অধিকারের সীমাংসা বাড়িয়ে নিত। সে যাই হোক, বিদ্রোহী ফ্রান্স Montesquie-র মত গ্রাহ্য করে' নিয়েই ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাহার আদ্ Constitution গড়ে। এ তন্ত্রে শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা রাজার হাতেই রয়ে গেল, প্রজার হাতে পড়ল শুধু—আইন তৈরি করবার ক্ষমতা। এই প্রতিনিধি সভা

আসলে ব্যবস্থাপক সভা হলেও, ইংলণ্ডের নজির দৃষ্টে প্রজার উপর টেক্স ধার্য্য করবার এবং বাৎসরিক বজেট পাশ করবার ক্ষমতাও এই সভা আত্মসাৎ করে নিলে। ইংলণ্ডের মতে এ ক্ষমতার অভাবে প্রজার কোন ক্ষমতাই থাকে না। আমরা মজা করে' টাকাকে রুধির বলি, কিন্তু উপমাটা নেহাৎ বাজে নয়। প্রজার হাতে টাকার থলি এসে পড়ায় রাজত্বের রক্ত-চলাচল বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাদের হস্তগত হয়। এই নমুনার গভর্ণমেণ্টর নামই হচ্ছে representative Government সে দিন পর্য্যন্তও জার্ম্মাণীতে এই ধরণের গভর্ণমেণ্টই ছিল।

(১০)

যে-দেশে representative Government আছে, এখন দেখা যাক্ সে-দেশে রাজার হাতে কি ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। শাসন-সংরক্ষণের একাধিক বিভাগ আছে, যথা,–administration, justice, finances, foreign affairs, army, navy, commerce, agriculture, education and public works ইত্যাদি ইত্যাদি। এর প্রতি বিভাগটি এক একটি রাজমন্ত্রীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়, এবং সেই রাজমন্ত্রী ক'টিকে নিয়ে যে মন্ত্রী-সমিতি গঠিত হয়, তারই নাম হচ্ছে—Executive Council. বলা বাহুল্য যে, সমগ্র দেশের শাসনভার এই মন্ত্রী-সমিতির হাতেই পুরোপুরি থাকে। ফলে যে দেশে Legislative-শক্তি থাকে প্রজার প্রতিনিধির হাতে আর Executive ক্ষমতা রাজমন্ত্রীর হাতে, সে দেশে এ দুয়ের ভিতর বিরোধ অনিবার্য্য। প্রতিনিধি সভা ক্রমান্বয়ে রাজমন্ত্রীদের সকল কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে, আর

রাজমন্ত্রীরা নিত্য প্রতিনিধি সভার দল ভাঙিয়ে সে সভাকে কাহিল করে ফেলবার চেষ্টা করে।

ফ্রান্সের উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে এই বিরোধের ইতিহাস। সে দেশে যে আশি বৎসরের মধ্যে তিনবার রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়েছে এবং ছ'বার গভর্ণমেণ্টের বদল হয়েছে, তার একমাত্র কারণ—Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর এই চিরদ্বন্দ্ব। এ বিরোধ দূর হল তখনই, যখন Executive রাজার অধীন না হয়ে Legislative Council-এর অধীন হল। এর চলতি উপায় হচ্ছে প্রতিনিধি সভার সভ্যদের মধ্যে থেকে জনকতককে মন্ত্রী নিযুক্ত করা, যাদের উক্ত সভার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এবং যাদের বরখাস্ত করবার ক্ষমতা উক্ত সভারে হাতেই থাকবে। Absolute monarchy-র দিনে—যেমন legislative এবং executive, উভয় ক্ষমতাই একমাত্র রাজার হাতে ছিল, পূর্ণাঙ্গ ডিমোক্রাসির দিনে, তেমনি ঐ দুই ক্ষমতাই একমাত্র প্রজার হাতে আসে। এই তন্ত্রের নামই হচ্ছে responsible Government, আর এই হচ্ছে ডিমোক্রাসির শেষ কথা।

(১১)

এতক্ষণ যদি পেরে থাকো ত আর একটু ধৈর্য্য ধরে আমার ব্যাখ্যান শুনলে, আমাদের পলিটিক্যাল মামলার মোদ্দা কথাটা জলের মত বুঝে যাবে। কারণ এ পত্রে আমি ইউরোপের পলিটিক্সের শুধু ক খ-র পরিচয় দিচ্ছি। প্রস্তাবনাটি যত লম্বা হয়েছে, উপসংহার তার সিকিও হবে না।

আমাদের গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থা এই। বিচার করবার আইন তৈরি করবার ও শাসন সংরক্ষণ করবার ক্ষমতা সবই আজ Bureaucracy-র হাতে। এদেশে অবশ্য Legislative Council আছে, এবং তাতে জনকতক প্রজার প্রতিনিধিও আছেন, কিন্তু আসলে এ Legislative Council, গভর্ণমেণ্টের Executive Council-এর সদর মহল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যবস্থাপক সভায় প্রজার মুখপাত্রেরা তর্ক করতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, কিন্তু কোন আইনের জন্মও দিতে পারে না, কোন আইনের ভ্রূমিষ্ট হওয়াও বন্ধ করতে পারে না, এক কথায় আমাদের প্রতিনিধিদের মুখ আছে কিন্তু হাত নেই। প্রমাণ—দেশী সভ্যদের সে ক্ষমতা থাকলে Rowlat Bill আর Rowlat Act হত না।

এই যুদ্ধের তাড়নায় ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি, ডিমোক্রাসির মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সুযোগে Congress এবং Moslem League, দু-জনে দু-হাত মিলিয়ে জোড়করে বিলেতের কাছে Representative Government ভিক্ষা করে। আর প্রায় ঠিক সেই সময়ে ইংরাজরাজ ভারতবর্ষকে চোখের এক নতুন কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন, যে-কোণকে দক্ষিণ কোণ আর ইংরাজিতে right angle বলা যেতে পারে, এবং সেই কারণে বিলাতের মন্ত্রীসভা এর উত্তরে বলেন যে—

The policy of His Majesty's Government is. ... the gradual development of self-govering institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire. They have decided that substantial steps in this direction should be taken as soon as possible."

আমরা ভিক্ষে চেয়েছিলুম reprsentative Government বিলেত দিতে চাইলেন, তার উপরে ফাউ হিসেবে কিঞ্চিৎ responsible Government। যত গোল বেধেছে ঐ একটা নিয়ে।

ফলে দাঁড়িছে এই যে, মণ্টেগু এবং চেম্‌সফোর্ড সাহেব উভয়ে মিলে reform bill-এর একটি খসড়া তৈরি করেছেন। যে শাসনযন্ত্র এঁরা গড়তে চাচ্ছেন সে এত জটিল যে, তার কলকব্জা সব তোমাকে চিনিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এ যন্ত্রের গড়নটা এত জটিল হবার কারণ, তার break-এর আধিক্য। মোটার গাড়ীতে সবে দুটি ব্রেক আছে, এক হাত-ব্রেক আর এক পা-ব্রেক। কিন্তু এ যন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গে ব্রেক আছে। মনে রেখো পার্লেমেণ্টের অভিপ্রায় হচ্ছে gradual development, সুতরাং ডিমোক্রাসির গতি এদেশে যাতে অতি ধীর-ললিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ যন্ত্র গড়া হয়েছে। অনেকের মতে, এ যন্ত্রের গতিরোধ করবার যত রকম কায়দা-কানুন বানানো হয়েছে তাতে ওটা চলবেই না। সে যাই হোক্ এই বিলের সর্ত্ত অনুসারে আমরা যে পুরো Represetative Government পাব না, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নেই।

গভর্ণমেণ্ট যেখানে পুরোপুরি representative নয়, সেখানে তা যে কি করে' responsible হতে পারে তা বোঝাই কঠিন। অথচ এ মীমাংসা করাই চাই, নচেৎ পার্লেমেণ্টের কথার খেলাপ হয়। এ মীমাংসা অন্য কোনও জাত করতে পারত কি না সন্দেহ, ইংরাজ-

রাজমন্ত্রীরা যে পারছেন, তার কারণ ইংরাজের রাজনীতি লজিকের তোয়াক্কা রাখে না।

অতঃপর মীমাংসাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, আধা representative Government-এর সঙ্গে আধা responsible Government জুড়ে দেও—এ দুটি যমজ ভ্রাতার মত এক সঙ্গে বাড়বে এবং কালক্রমে দুই যখন সাবালক হবে তখন ভারতবর্ষ Canada প্রভৃতির মত "an integral part of the British Empire" হয়ে উঠবে।

আপাতত কোথায় এবং কতটুকু responsible Government দেবার প্রস্তাব হচ্ছে জানো?—বড়লাটের বড় খাসদরবারে নয়—প্রাদেশিক ছোটলাটদের যত ছোট ছোট খাসদরবারে। এই ছোটলাটদের দরবারে নানারূপ শাসন-বিভাগ আছে, তারই দুটো একটা নিরীহ-বিভাগ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভার দুটি একটি সরকারের মনোনীত সভ্যকে দেওয়া হবে। যে-সব বিভাগের কাজ হচ্ছে রাজ্য-শাসন ও সংরক্ষণ করা সে সব বিভাগ নয় কিন্তু যে সব বিভাগের কাজ হচ্ছে দেশের উন্নতি সাধন করা সেই সব বিভাগ, যথা—শিক্ষা-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ ইত্যাদি, অর্থাৎ রাজ্য-চালনার ভার থাকল রাজপুরুষদের হাতে আর প্রজার উন্নতি করবার ভারপড়ল প্রজার প্রতিনিধির হাতে। ভাষান্তরে প্রজাকে শাসন করবার ক্ষমতা রয়ে গেল তাঁদেরই হাতে, এখন তা আছে যাদের হাতে। এবং প্রজাকে লালন করবার দায় পড়ল তাঁদের ঘাড়ে যাঁরা কস্মিনকালেও কোন রাজকার্য্য চালান নি। এরই নাম diarchy.

অতএব দাঁড়াল এই যে, দেশের ঘরকন্না চালাবার সেই বন্দোবস্ত করা হল যে-বন্দোবস্তে আমাদের পারিবারিক ঘরকন্না চালান হয়। পারিবারিক-গভর্ণমেণ্টের যেমন কতক বিভাগ থাকে

আমাদের হাতে আর কতক বিভাগ তোমাদের হাতে, এই নব-শাসন-তন্ত্রেরও তেমনি বড় বিভাগগুলো থাকবে ওঁনাদের হাতে আর ছোটগুলো আমাদের হাতে।

পৃথিবীতে আর কোথাও যে এ বন্দোবস্ত নেই তার কারণ পৃথিবীর আর কোনও জাতের অবস্থাও আমাদের মত নয়। ভারতবাসীরা আবহমান কাল দোটানার মধ্যেই পড়ে আছে। এ দেশের যে-যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করো দেখতে পাবে একদিকে রয়েছে রাজভাষা আর একদিকে রয়েছে লোকভাষা, একদিকে রয়েছে পোষাক অর্থাৎ রাজবেশ আর একদিকে রয়েছে আটপৌরে কাপড় অর্থাৎ লোকবেশ। আর আমরা ভদ্রলোকেরা—এক সঙ্গে এ দুই-ই অঙ্গীকার করে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে আসছি; সুতরাং রাষ্ট্রতন্ত্রে এই diarchy আমাদের দেশেরই উপযুক্ত হয়েছে।

যদি বলো এ ঘরকন্না চলবে কি রকম? তার উত্তর, সে নির্ভর করবে কাকে রাজস্ত্রী আর কাকে লোকমন্ত্রী করা হয় তার উপর। যদি স্ত্রী পুরুষে মনের মিল থাকে তাহলে চলবে নিখিরখিচে আর তা যদি না থাকে ত দিনরাত খিটিমিটি হবে। এই দু-ইয়ারকি duet ও হতে পারে dud ও হতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে, এ বন্দোবস্তে Bureaucracy-র তরফ থেকে এত আপত্তি উঠছে কেন? আপত্তি উঠছে এই ভয়ে যে, প্রজার প্রতিনিধিরা মন্ত্রী-সভায় ছুঁচ হয়ে ঢুকবে আর ফাল হয়ে বেরুবে। আর এ পক্ষ যে এই বন্দোবস্ত বজায় রাখবার জন্য এতটা জেদ করছেন, তার কারণ অপর পক্ষের যেটা আশঙ্কা এ পক্ষের সেইটেই আশা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সৎ—চিদ্—আনন্দ।

—:০:—

"আমি আছি!"
—কে শুনাল হেন অমিয় কথা!
আছ তুমি রোমে রোমে,
আছ তুমি ব্যোমে ব্যোমে,
অভয় প্রতিষ্ঠা তব
সর্ব্বকালে সর্ব্বগতা।
তুমি সৎ—মধুময় এ বারতা।

"আমি জ্ঞান!"
—কি সুধা সম্বাদ হল রটনা!
জ্ঞানে কর সুখ সৃষ্টি,
দুঃখে রাখ জ্ঞান দৃষ্টি,
জ্ঞানমনন্তং জ্ঞান
পূর্ব্ব জগত-ঘটনা।
তুমি চিদ্—ধন্য হল এ চেতনা।

"আমি রস।"
—কি অমৃত-ভাষে ভরিল এ কান!
ওহে প্রেম, হে আনন্দ!
ঘুচিল সকল দ্বন্দ্ব।
সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম,
অপ্রিয় প্রিয় সমান।
তুমি আনন্দ,—নন্দিত এ-পরাণ!

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী।